(1)গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রী করন বলতে কী বোঝ?
উঃ- গনতন্ত্রে যদি জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত না করা হয় তাহলে তা কখনোই পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে না। আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে গনতন্ত্র হল শ্রেষ্ট ও শাসন ব্যবস্থা, গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে দরকার প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ করেন করেন। বিকেন্দ্রী কারণের অর্থ হল গণতান্ত্রিক অধিকারকে তৃনমূল পর্যায় পর্যান্ত জনগণের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। এই শাসন ব্যবস্থার জেলা, মহকুমার, ব্লক, গ্রাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেরাই স্বাধীন ভাবে সরকার গঠন করে এবং পরিষেবা মূলক পক্ষ অন্যান্য কাজ পরিচালনা করে। স্থানীয় শাসনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কারণের ধারণা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। এই শাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় মানুষের কল্যান সাধন করা, ভারতবর্ষে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা গ্রামীন জীবনের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং নগর জীবনে পৌরসভা এবং পৌরনিগমের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকৃত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(2) গ্রাম পঞ্চায়েত কিভাবে গঠিত হয়?
উঃ -১৯৭৩ সালে পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কোনো একটি মৌজা বা মৌজার কোনো একটি অংশ পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি অংশের সমষ্টিকে নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হবে। গ্রামের নাম অনুসারে রাজ্য সরকার প্রতিটি গ্রামের জন্য পঞ্চায়েত গড়ে তোলেন বিধানসভার ভোটদাতা হিসাবে ভোটের ভোটার তালিকার ভুক্ত হয়েছে এমন ব্যক্তিদের গোপন ভোটের দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

3. পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কয়টি স্তর ও কি কি?
উঃ -পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তর-
(১) গ্রাম পঞ্চায়েত
(২) গ্রাম পঞ্চায়েত সমিত
(৩) জেলা পরিষদ।

6. গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নিযুক্ত হন কিভাবে?
উঃ -ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভায় মধ্য থেকে একজনকে প্রধান করে অপর একজনকে উপপ্রধান পদে নিযুক্ত করেন।

7. গ্রাম পঞ্চায়েত র প্রধানকে কিভাবে অপসারণ করা যায়?
উঃ -গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে অপসারণ করতে হলে একটি বিশেষ সভা ডাকতে হয়, ওই সবাই অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি যদি পঞ্চায়েত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভোটের গ্রহণ করা হয় তাহলে তাকে অপসারণ করা যায়।
8. গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দুটি কাজ উল্লেখ কর?
উঃ -(১) তিনি অর্থনৈতিক কার্যনির্বাহী প্রশাসনিক পরিচালনা করেন।
(২) রাজ্য সরকারের যেসব কর্মচারী ও আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারতি করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান.।

9. গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের দুটি উৎস উল্লেখ কর?
উঃ -(১) গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যেসব আর্থিক সাহায্য ও অনুদান দেয়।
(২) পঞ্চায়েত যেসব কর আরোপ করেন তা থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় সেটি হল গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস।
9. গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক কত হতে পারে?
উ-সর্বনিম্ন পাঁচজন, এবং সর্বাধিক ৩০ জন হতে পারে।

10. গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাধীন কর্তব্য উল্লেখ কর?
উঃ - ,(১) নথিপত্র সংক্রান্তমূলক কর্তব্য:-জনগণনা, কৃষি সামগ্রিক, গবাদি বসু, বেকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেন প্রভৃতি সম্পর্কে পরিসংখ্যান মূলক নির্বাচন করা।
(২) সাংস্কৃতিক কর্তব্য:-বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি খেলাধুলা প্রভৃতি বিকাশ সাধন ঘটানো।
11. সভাপতি কাকে বলা হয়? উঃ -পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হয় সভাপতি।
12. সভাপতি এর দুটি কাজ উল্লেখ করো?
উঃ -(১) রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির জন্য যেসব কর্মচারী নিয়োগ করেন তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধান করা।

(২) রাজ্য সরকার যদি কোন কর্তব্য দেন তাহলে তিনি সেটা পালন করেন।

13. পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের দুটি উৎস উল্লেখ কর?
উঃ - (১)যে সমস্ত বিদ্যালয়ের হাসপাতাল, কলকারখানা পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনা করেন সেগুলি থেকে পাওয়ায় আয়।
(২) পদ কর, অভিকর এই সমস্ত কর থেকে পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের উৎস।

14. জেলা পরিষদ কাদের নিয়ে গঠিত হয়?
উঃ -জেলা পরিষদ যেসব সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় তারা হলেন সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েত সমিতির গুলি সদস্যবৃন্দ ভোট দাতাদের দ্বারা প্রতিটি ব্লক থেকে সর্বাধিক তিনজন সদস্য সংশ্লিষ্ট জেলার ভোটদাতা হিসাবে নাম তালিকাভূক্ত থাকলে ও মন্ত্রীরা এর সদস্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে রাজ্যসভার সদস্যগণ তা ছাড়া রাজ্য বিধানসভার ও লোকসভার সদস্যরা জেলা পরিষদের সদস্য হতে পারে না।

15. সভাপতি কিভাবে নিযুক্ত হন ?এর কাজ লেখ?
উঃ-জেলা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হয় সভাপতি। জেলা পরিষদের প্রথম সভায় জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করেন।
কাজ:-(১) রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত জেলায় পরিষদের অফিসারদের তত্বাবধন করা।
(২) জেলা পরিষদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সাধারণ দায়িত্ব পালন করেন।

16. জেলা পরিষদের আয় দুটি উৎস ও কাজ উল্লেখ কর?
উঃ -(১) সংশ্লিষ্ট জেলার সড়ক থেকে আরব করা কর।
(২) রাজ্য সরকারের আদায় করা ভূমি আদায় করা কর।
কাজ :-(১) জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি কে অনুদান দিয়ে থাকে।
(২) পঞ্চায়েত সমিতি গুলি যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে জেলা পরিষদ সেই গুলির মধ্যে সম্বন্ধ সাধন করে থাকে।

17 যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?
উঃ -যুক্তরাষ্ট্রীয় বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যে যেখানে কেন্দ্র সরকার ও আঞ্চলিক সরকার গুলির মধ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন করা দেওয়া হয়। এবং সংবিধানে উল্লেখিত বিভিন্ন বিধি নিয়ম দ্বারা উভয় সরকার শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকে।

(18) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূলত কয় ধরনের সরকার দেখা যায়?
উঃ -ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় তিন ধরনের সরকার দেখা যায়, যথা:-
(১) কেন্দ্রীয় সরকার
(২) রাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকার
(৩) কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের জন্য সরকার।

19. ভারতীয় সংবিধানের সংযোজিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ কর?
উঃ -(১) ভারতের প্রতিরক্ষা.
(২) কূটনৈতিক বিষয়!
(৩) পারমাণবিক শক্তি।
(৪) অন্তরাজ্য নদী উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করা।

20 ভারতীয় সংবিধানের সংযোজিত রাজ্য তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ কর?
উঃ -(১) জনশঙ্খলা, (২) জেল, (৩) পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, (৪) কিসে জমির ওপর কর।
21. মূল সংবিধানে রাজ্য তালিকায় কয়টি বিষয় ছিল?
উঃ -৬৬ টি বিষয় ছিল।
22. বর্তমান রাজ্য তালিকার কয়টি বিষয় আছে?

উঃ -৬১টি বিষয় আছে।

23 অর্থ কমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ কর? কে অর্থ কমিশন নিযুক্ত করেন? অর্থ কমিশন কিভাবে গঠিত হয়?
উঃ কাজ:-(১) অর্থ কমিশন ঠিক করে দেয় ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে কোন রাজ্যকে কত অনুদান দেওয়া হবে।
(২) ভারতে একটি মজবুত অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি যেসব বিষয় কমিশনের হাতে যে দায়িত্ব দেয় সেই সব দায়িত্ব পালন করবে।
সংবিধানে ২৮০ নং ধারা অনুসারে অর্থ কমিশন নিযুক্ত করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।
ভারতের এই অর্থ কমিশনের একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।

24. দুটি তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি ?
উঃ -আইনের প্রণয়নের ব্যাপারে কোনো বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় দ্বারা প্রণীত আইন বলবৎ থাকবে এবং রাজ্য আইনের বিতর্কিত ও অসংগতিমূলক বাতিল বলে গণ্য হবে।
25. THE FOUNDATION OF NEW INDIA বইটি কার লেখা?
উঃ -K.M. PANIKKAR.
26. INDIA GOVERNMENT AND POLITICS বইটি কার লেখা?
উঃ -M.L SIKRI .
27. ভারতীয় সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?
উঃ -ডক্টর বি আর আম্বেদকর।

(1)ভারতের সংবিধান করে রচিত হয় এবং গৃহীত হয় এবং করে থেকে কার্যকরী হয়;
উ:- ভারতীয় সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয় 1949 সালে 26 শে নভেম্বর এবং কার্যকরি হয় 1950 সালে 26 শেষ জানুযারী,

(২) কতজন সদস্য নিয়ে গনপরিষা গঠিত হয়? সদস্যদের মধ্যে কতজন নির্বাচিত হন ও কত জন মনোনীত ছিলেন?
, " উ:- গনপরিষদের মোট সদস্য 389 জন ছিল ও এর মধ্যে 296 জন নির্বাচিত 93 জন মনোনীত ছিলেন।

(3) গণপরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?
উঃ- গণপরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একটি লিখিত সংবিধানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ৰূপরেখা স্হিরকরা।
(4)ভারতীয় সংবিধানে মোট কয়টি ধারা ও কয়টি তপশীল ছিল ?
উঃ- প্রথমে ভারতীয় সংবিধানে মোট 395 টি ধারা বহু উপধারা এবং 8 টি তপশীল ছিল। পুরবর্তী কালে বার বার সংবিধানে পরিবর্তীত হয়ে সংবিধানে বহু উপধারা এবং তপশীল সংযোজীত হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে 450 টি ধারা এবং তপশীল রয়েছে 12টি।

(5) ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য কী কী ?
উঃ- (1) বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান,
(2) প্রস্তাবনায় সংযোজন।
(3) সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থা,
(4) ধর্মনীরপেক্ষতা,
(5) কতগুলি মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের সংযোজন,

(6) প্রস্তাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য লেখো ?
উঃ- প্রস্তাবনা সংবিধানে কার্যকরী অংশের অন্তরভুক্ত নয় বলে এর আইনগত মূল্য বিশেষ নেই সত্য, তবে এর গুরুত্ব তাৎপর্য হল এই যে – (1) প্রস্তাবনা সংবিধানের উদ্দেশ্য ও রীতি সম্পর্কে ধারনা দেয়।
(2) সংবিধান করে গৃহীত হয়েছিল তা প্রস্তাবনা থেকে জানা যায়,
(3) সংবিধানের মূল অংশে কোনো শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট না থাকলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়।

(7)ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় কীকী আদর্শ ও লক্ষের কথা বলা হয়েছে?

উঃ- প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনীর পেক্ষ গনতান্ত্রিক, সাধারনতন্ত্র বলে ঘোষনা করা হয়েছে। এছাড়া ন্যায় বিচার, সাম্য, ব্যক্তি মর্যদা, সৌভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় এবং ও সংহতীর কথা বলা হয়েছে।

(8) ভারতীয় সংবিধানে কত ধরনের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।
উঃ :- (1) সাম্যের অধিকার (14-18)
(2) স্বাধীনতার অধিকার (19-22)
(3) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (23-24)
(4) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (25-28)
(5) শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ক অধিকার (29-30)
(6) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (32-35)

(9) সংবিধানে 21নং ধারার উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিকারের বিশেষ তাৎপর্য কী?
উঃ- 1978 সালে প্রণীত 44তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয় জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি একটি বিশেষ ঘোষণা বলে অন্যান্য মৌলিক অধিকার সময়িক ভাবে স্বগীত করতে পরলেও 21 নং ধারায় বর্ণিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্বগীত করে রাখা যাবে না।

(10) সংবিধানে 14নং ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
উঃ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য করতে বোঝায় বিশেষ কোনো সূযোগ সুবিধা অনুপস্থিতি এর উর্দ্ধে আইনের ক্ষমতা ,পদমর্যাদা ,নির্বিশেষে প্রত্যেক সাধারন আইনের অধীন প্রত্যেকে সাধারণ আইনের দ্বারা সমান ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার বলতে বোঝায় অসামর্যাদা ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইন সমভাবে প্রযুক্ত হবে। রাষ্ট্র কোনো ভাবে বৈষম্য মূলক কাজ করবে না

(11) নিবর্তন মূলক আটক আইন বলতে কী বোঝ?
উঃ- বর্তমানে কোনো অপরাধে অপরাধী নয় অথচ ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে এই সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে আটক করার বা বিধি তাকে নীবর্তন মূলক আটক আইন বলে। এই আইনের ক্ষেত্রে সরকারকে গ্রেপ্তার বা আটকে কারণ জানাতে হয় না, কিংবা আদালতের সামনে সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে হয় না।

(12) চারটি নিবর্তন মূলক আটক আইনের নাম লেখ ?
উঃ- 'মিসা' 'নাসা' পি.ডি.এ, পোটা, এছাড়া ইউ. এ.পি.এ

(13)যে কোনো দুটি গুরত্বপূর্ণ নীদেশ মূলক নীতি উল্লেখ করো ?
উঃ- (1) রাষ্ট্র এমন ভাবে তার নীতিগুলিকে পরিচালনা করবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়
(২) রাষ্ট্র আন্তরর্জাতিক শান্তী ও নীরাপত্তার ভিত্তিতে সচেষ্ট হয়।

(14) মিসা 'নাসা'Cofeposa, Pota, Tada এগুলির পুরো নাম কী?
উঃ- (1) মিসা :- Maintenance of internal Security Act
(2) নাসা :- National Security Act
(3) COFEPOSA: - Conservation of Foreing Exchange and Prevention of Smuggling Activities.
(4) POTA : - Prevention of Terrorism Act
(5) TADA: Terrorist and Disruptive Activities Act,

(15)আইনের যথাবিহীত পদ্ধতি বলতে কী বোঝো?
উঃ- মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্ট আইনের যথাবিহীত পদ্ধতি অনুসারে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারে। এই পদ্ধতি অনুসারে বিচার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে সুপ্রিমকোর্ট শুধু আইনের পদ্ধতিগত দিকটি বিচার করে না, সেই

সঙ্গে আইনটি যৌথিকতা বিচার করে। অর্থাৎ কোন আইন ন্যায়নীতির বিরোধী কিনা তা বিচার করতে পারে এই ক্ষমতা ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নেই।

(16) আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলতে কী বোঝ?
উ:-আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতিটি সংবিধানে ২1 নং ধারায় ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন হলে আদালত বিচার করে দেখবে যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়েছে তা বৈধ কিনা আদালত ঐক্ষেত্রে আইনের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবে না।

(17) সংবিধানে 24 (ক) নং ধারায় কী বলা হয়েছে,
উঃ- এই ধারায় বলা হয়েছে যে 6-14 বছর বয়স্ক সকল ছেলে মেয়ে দের জন্য রাষ্ট্র অবৈতনিকা এবং বাধ্যতা মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।
(18) সংবিধানে 21(ক) নং ধারাটি কতসালে কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে?,
উঃ- 2002 সালে প্রনীত 86 তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে।
(19)মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝোয়,
উ:- মৌলিক অধিকার বলতে সেই অধিকার গুলিকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য যেগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য।

(20) কোন পদ্ধতিতে কার দ্বারা এবং কোন রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হয়ে থাকে।
উঃ- সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে ইরপিচম্যান্ট পদ্ধতির মাধ্যমে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে উত্তাপিত করার অভিযোগে প্রস্তাবটি উত্তাপ জন্য 14 দিন আগে নোটিশ দিতে হয়। পার্লায়েন্টের উভয় বাসের 2/3 অংশের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন।

(21)সখ্যালঘু সরকার বলতে কী বোঝায়,
উঃ- যে দল বা জোট সরকার গঠন করে সেই দল বা জোটের সদস্য সংখ্যা পার্লামেন্টে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তখন তাকে সংখ্যালঘু সরকার বলে।

(22)মন্ত্রী পরিষদের যৌথদায়িত্বশীলতা বলতে কী বোঝায়?
উঃ- সংবিধান অনুসারে মন্ত্রী পরিষদের যৌথভাবে লোক সভার কাছে দ্বায়িত্ব শীল থাকতে হয় এই নীতি অনুসারে মন্ত্রী সভাকে শাসন কার্য পরিচালনার ব্যাপারে যেকোনো ভুল ত্রুটির জন্য লোক সভার কাছে দায়ী থাকতে হয়, কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা সমগ্র মন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে লোক সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।
(23)পার্লামেন্টের প্রতিকক্ষের অধিবেশনে আহ্বান করেন কে? এবং কতদিন অন্তর এই অধিবেশন আহ্বান করতে হয়?
উঃ- পার্লামেন্টের প্রতিকক্ষের অধিকশন আহ্বান করা এবং অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে। তিনিই এই ক্ষমতার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করেন। সংবিধান অনুসারে একটি অধিবেশনের শেষের দিন থেকে পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ দিনের মধ্যে ব্যবধান এবং যেন 6 মাসের বেশি না হয়।

(24)রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিরণ প্রশ্নের বিচার করেন কে?
উঃ- 1978 সালে প্রণীত সংবিধানে 44 তম সংবিধান সংশোধনীর ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে।

(25)ভারতের রাষ্ট্রপতি কীভাবে এবং কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন ?
উঃ- একক হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিদ্ধিত্বের সার মাধ্যমে গোপন ভোটের মাধ্যমে একটি নির্বাচক সংস্থার দ্বারা পরক্ষভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয় ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগন এবং রাজ্য আইন সভার নিম্নকক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণকে নিয়ে।

(26,)উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে কারা?
উঃ- পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক মন্ডলীর দ্বারা গোপন ভোটের দ্বারা 5 বছরের জন্য উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

(27) কিচেন ক্যাবিনেট কী?
উ:- সাধারনত দেখা যায় প্রধান মন্ত্রী তার ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে দুই-তিন জনের সভে বেশি ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখে এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাঁরতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি কার্যাবলি পরিচালনা করেন। প্রধান মন্ত্রীর এই একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মিদের নিয়ে গঠিত হয়। কিচেন-ক্যাবিনেট।
(28)প্রধান মন্ত্রীকে কীভাবে অপসারন করা যায়?
উঃ- ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে অপসারন করার জন্য কোনো ইসপিম্যান্ট পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না, লোকসভায় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হলে প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।
(29) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলে কী কী যোগ্যতার প্রয়োজন?
উঃ- (১)ভারতীয় নাগরীক হতে হবে।
(২) 35 বছর বয়স্ক হতে হবে।
(৩)রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।
(৪)সরকারি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হলে চলবে না।

(30) সুপ্রিম কোর্টের বিচার পতিদের কী ভাবে অপসারন করা যায়?
উঃ- প্রমাণিতঅসদাচারনের বা অসামর্থ্যের অভিযোগের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট দান কারী সদস্যের 2/3 অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হলে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি সেই বিচার পতিকে পদচ্যুত করতে পারেন।

(31)জনস্বার্থবাহী মামলা বলতে কী বোঝায়?
উঃ- কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ নয়, জনগনের স্বার্থ সম্পর্কিত মামলা হন জনস্বার্থবাহী মারলা। এই মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা অনেক বার পি.এন. ভগবতীর মাতে জনস্বার্থবাহী মামলা হল আইনের সাহায্য বিষয়ক আন্দোলনের একটি কৌশল বা হাতিয়ার।

(32)বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা বা বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বলতে কী বোঝো?
উঃ- ভারতীয় সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যা বার্তা হিসাবে সুপ্রিয় কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুপ্রিমকোর্ট আইন বিভাগের কোনো আইন ও শাসন বিভাগের কোনো নির্দেশ সংবিধান বিরোধী হলে তা সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বা বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বলে,
(33)লোক সভার অধ্যক্ষ কী ভাবে নিযুক্ত হন?
উঃ- নিবনির্বাচিত লোক সভার প্রথম অধিবেশনে লোক সভার সদস্যগন নিজেদের মধ্য থেকে একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন।
(34)লোক সভার অধ্যক্ষকে কীভাবে অপসারন করা যায়?
উঃ- লোক সভার অধ্যক্ষকে পদচ্যুত করতে হলে 15 দিনের নোটিশ দিতে হয়। অতঃপর অধ্যক্ষয়ের পদচ্যুতির প্রস্তাব সদস্যদের অধিকাংদের দ্বারা সমর্থিত হলে তিনি ২০ অপসারিত হন।
(35)ভারতীয় পার্লায়েন্ট কী কী অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়।
উঃ- রাজ্য সভা, রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভা বা পার্লামেন্ট গঠিত হয়।

(36)সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বলতে কী বোঝ?
উঃ- যেসব মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে কোনো দেশের সংবিধান দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি সেই দেশের মৌলিক কাঠামো বলে বিবেচিত হয়। বোবানন্দ ভারতী মামলায় প্রধান বিচার প্রতি সক্রিয় মৌলিক কাঠামো হিসাবে ৫ টি বিষয়কে চিহ্নিত করে ছিলেন যথা:- সংবিধানের প্রধান্য, গণতান্ত্রিক ও সাধারন তান্ত্রিক ক্ষমতা বিভাজন ও যুক্তরাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা।

(37) ভারতের সংবিধান অনুযায়ী অর্থবিল কাকে বলে?
উ:- ভারতীয় সংবিধানে 110 নং ধারা অনুসারে যেসব বিলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বা এদের কোনো একটি বিষয় অন্তর ভুক্ত থাকে সেইসব বিল অর্থ বিল নামে, পরিচিত যথা:-
(1) কোনো বার ধার্য, বিলোপ, পরীবর্তনবা নীয়ন্ত্রন।
(২) ভারতের সঞ্চিত তহবিলে অর্থ প্রদান বা প্রত্যাহার।

(38) ঝুলন্ত বা হ্যাং পার্লামেন্ট বা সংসদ কাকে বলে?
উঃ- সাধারণ নির্বাচনের পর যদি দেখা যায় কোনো দল বা জোট আইন সভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে তখন সেই অবস্থানকে বুঝেন্ত সংসদ বা হ্যাং পার্লামেন্ট বলে।
(38)রাজেট কাকে বলে?
উ:- আর্থিক বছর 1 এপ্রিল থেকে ও। মার্চ শেষ হওয়ার আগে সরকার পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য যে আয় ব্যায়ের খড়মা প্রস্তুত করে তাকে বাজেট বলে। সরকার সমস্ত দপ্তরের আয় ব্যায়ের হিসাব পাওয়ার পর চূড়ান্ত ব্যাজেটের খড়সা প্রস্তুত করেন।
(40) মৌলিক অধিকারগুলি কী সংশোধন যোগ্য।
উঃ- 1971 সালে প্রনীত 25তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়। পার্লামেন্ট তার সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতা বলে মৌলিক অধিকার সহ সংবিধানে যে কোনো অংশে সংশোধন করতে পারে। তবে এই ক্ষমতা বলে পার্লামেন্ট সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না।

(41) 86তম সংবিধান সংশোধন (২০০২) এর মাধ্যমে মৌলিক অধিকারে কী পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে?
উঃ- ২০০২ সালে প্রনীত ৪তেম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ২1 নং ধারার সঙ্গে (ক) উপধারাটি যোগ করে শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। 21(ক) নং ধারায় বলা হয়েছে 6-14 বছরের ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

(42) লোকসভার গঠন সম্পর্কে লেখ?
উঃ- ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নাম হলো লোকসভা, লোকসভা অনধিক 552 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা সর্বাধিক 530 জন হতে পারে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের প্রতিনিধির সংখ্যা হল ২০ জন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ইঙ্গ- ভারতীয় সদস্য সংখ্যা হল 2 জন। বর্তমানে লোকসভার সদস্য সংখ্যা 545। এর মধ্যে 530 জন অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধির সংখ্যা 13 জন এবং ২ জন ইভ - ভারতীয় প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। সংবিধানের 330 নং ধারানুযায়ী লোকসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষরণের ব্যবস্থা করা আছে।

(43) রাজ্য সভা গঠন সম্পর্কে লেখো ?
উঃ- সংবিধানের 80 নং ধারার রাজ্যসভার গঠন 'সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে। রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা 250 জনের বেশি হবে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চাবুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছিল তাদের মধ্য থেকে 12 জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৮ মনোনীত হয়ে থাকেন। রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচনি যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকাল প্রভৃতি।
রাজ্যসভার সদস্য হবার যোগ্যতা:- (১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
(2) 30 বছর ন্যূনতম বয়স হতে হবে।
(44)আইনের চোখে আস্য বলতে কী বোঝো?
উঃ- ডাইসির মতানুসারে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বোঝায় যে, মর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে কোনো ও ব্যক্তিই দেশের আইনের ঊর্ধ্বে নয় সকল ব্যক্তিই, প্রধানমন্ত্রী শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই দেশের সাধারণ আইনের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং সাধারণ আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সকল কাজের জন্য আইনের কাছে সমানভাবে দায়িত্বশীল, কোনো ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে পারবে না সংবিধানে। তাকে আইনের চোখে বা দৃষ্টিতে সাম্য বলে।

(45) ভারতীয় সংবিধানে ২০ নং ধারায় কী কী অধিকারের কথা বলা হয়েছে,
উ:- (1) কোনো ব্যক্তি রো কোনো অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না যদি না সে কাজ করার জন্য অপরাধ হয়েছে বলে অভিযোগ করা সেই কাজ করার সময় বলবৎ কোনো আইন সেলম্বন করে থাকে, আবার অপরাধ করার সময় বলবং বিধি অনুযায়ী যে দন্ত দেওয়া যেতে পারত তার চেয়ে বেশি দন্ডও দেওয়া যাবে না।
(২) একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিক বার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা যাবে না।
(3) কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে বাধ্য করা যাবে না। আইন অনুযায়ী, বিচার ব্যবস্থার দ্বারা রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হয় যে কোনো ব্যক্তি দোষী।

(46)ধর্মনীর পেক্ষতা বলতে তুমি কী বোঝো?   Dddddd
উঃ -ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা যথেষ্ট কঠিন, ধর্ম নিরপেক্ষ তার জনক হিসাবে পরিচিত জর্জ বেবাক হলোয়েবা ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মীয় ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পৃথকীকরণ কে বোঝাতে চেয়েছিলেন। তারই সময়কালে জোশেক গ্র্যাডলাফ ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন এবং বিজ্ঞান সাধনার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর পাস্তিকতা কেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে মনে করেন।

(47)বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ কী ?
উঃ- 'হ্যাবিয়াস করপাস একটি ল্যাটিন শব্দ এর ইংরেজী অর্থ হল Have The body present অর্থাৎ সশরীরে হাজির করার। এই আদেশ-বলে আদালত আটককারী কর্তৃপক্ষকে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেয়। আটক বিধিসম্মত না হলে আদালত আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বন্দী প্রত্যক্ষীকরনের উদ্দেশ্য হল বে-আইনীভাবে বা বৈধ কারন ছাড়া আটক করা ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া। এর দ্বারা অন্যায়কারীর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় না,, আটককারী ব্যাঁক বা কর্তৃপক্ষের উপর এই লেখ জারী করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট এই লেখ জারি করতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট একমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই লেখ জারি করতে পারে, কিন্তু হাইকোর্ট রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই বন্দী - প্রত্যক্ষীকরণ জারি করতে পারে।

(48)পরমাদেশ কাকে বলে বা কী?
উঃ- 'ম্যান্ডে মাস' একটি ল্যাটিন শব্দ। এর ইংরেজী অর্থ we order: অর্থাৎ আমরা আদেশ করি। আদালত এ ধরনের আদেশের মাধ্যমে সরকার, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সর্বসাধারনের দায়িত্বযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তার আইনানুগ কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পররাদেশ জারি করা যায় না।

(49)অধিকার পৃচ্ছা কী?
উঃ- এর অর্থ হল অধিকারে। আইনসম্ভূতভাবে কোন বিশেষ পদে নিযুক্ত না হয়েও কোনো ব্যক্তি সেই পদ দাবি করলে তার দাবির বৈধতা বিচারের জন্যে এই লেখ জারি করা হয়। দাবি আইনসম্ভূত না হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হয়। তবে কেবলমাত্র সরকারী পদের ক্ষেত্রেই অধিকার- পৃচ্ছা প্রযুক্ত হয়।

(50)প্রতিষেধ কী?
উঃ- এর অর্থ হল নিষেধ করা, উর্ধ্বতন আদালত নিম্নতন আদারতেকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই লেখ জাবি করে। তা ছাড়া স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বিরোধী কাজ না করার জন্য 'প্রতিষেধ জারি করা যায়। ঊর্ধ্বতন আদালতের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে লংঘনকারী কেআদালত
অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা যায়, প্রতিষেধএকমাত্র আদালতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ বিচার - বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই প্রতিষেধ প্রযুক্ত হয়। আইন-বিষয়ক ক্ষমতার উপর এই লেখ প্রয়োগ করা হয় না।

(51)উৎপ্রেষন কী?
উঃ- এর অর্থ বিশেষভাবে জাত হওয়া। নিম্নতন আদালত বা বিচারকার্যের ক্ষমতাযুক্ত প্রতিষ্ঠান নিজ এক্তিয়ারের বাইরে গেলে এই লেখার সাহায্যে মামলাকে উর্ধ্বতন আদালত স্থানান্তরিত করা যায় এবং এক্তিয়ার বর্হিভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ও উৎপ্রেষন জারি করা যায়।

(55) প্রস্তাবনা উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি কি?
উঃ- প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত ধর্মনীরপেক্ষ কথাটির অর্থ যে ভারতের কোন ধর্মের স্থান নেই বা ভারতবাসী জীবনের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মনীরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র, কোন বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতার কারণ না বরং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না, অর্থাৎ ভারতবর্ষে ধর্মনীর পেক্ষ বলতে সকল ধর্মকেয়সমান মর্যাদা দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

(56)ভারতের সংবিধানে কর্মের অধিকার কতরুপ সংরক্ষিত হয়েছে ?
উঃ- ভারতীয় সংবিধানে কর্মের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বকৃতী পায়নি। তবে সংবিধানে চতুর্থ অধ্যায় নির্দেশ মূলক নীতিতে স্ত্রী -পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকে পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকারে এবং সমান কাজের জন্য মজুরী পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

((57)সংবিধানের 226নংধারায় কী বলা আছে,?
উঃ- সংবিধানে 226 নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষন এবং IV কোন উদ্দেশ্য বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার ইচ্ছা এবং উপ্রষন এই পাঁচ ধরনের লেখ নির্দেশ এবং আদেশ জারি করতে পারে সংবিধানে,
(58) 21(ক) নং ধারাটি কতসালে কত তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংযোজীত হয়েছে,
উঃ- ২০০২ সালে প্রণিত 86 তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে।

59)ভোটাধিকার কী একটি মৌলিক অধিকার ?
উঃ- ভারতীয় সংবিধানে ভোটাধিকার এক নাগরিককে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বকৃতি দেওয়া হয়নি এই অধিকার টি পঞ্চদশ অংশে 326নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

(60) 2002 সালে প্রণিত 86তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে 81 (40) নং ধারায় যে মৌলিক কর্তব্য সংযুক্তি হয়েছে তা উল্লেখ করো ?
উঃ- প্রত্যেক পিতামাতা বা অভিভাবক তার 6-14 বছর বয়স পর্যন্ত পুত্র-কন্যাদের নির্ভরশীল শিশুদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করবে।

(61) আন্তঃরাজ্য পরিষদ কী?
উঃ- সংবিধানের 263 নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য গুলির মধ্যে সম্মতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারবে। সংবিধানের 363 নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য গুলির সহযোগীতার এবং সংগতী সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি এই পরিষদের ক্ষমতা হবে রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের কারন। অর্থ সাহায্য করা এবং বোন্ডের সাধারণ স্বর্থে জড়িত আছে। এমন বিষয় গুলিকে আলোচনা করা।

62)সরকারী কমিশন কী ?
উঃ- ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রবতী ইন্দারী গান্ধি কেন্দ্র - রাজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য 1983-সালে 24মার্চ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে এই কমিশন সরকারি কমিশন নামে পরিচিত।

(63)ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রগুলি কী কী ?
উঃ- কেন্দ্র, 27টি অঙ্গরাজ্য, 8টি কেন্দ্রশাষিত রাজ্য জম্মু কাশ্মীর, লাদাখ, এবং একটি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (দিল্লি) নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।
(64)কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তরভুক্ত বিষয় গুলি কী কী?
উ:- প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অন্তঃরাজ্য বাণিজ্য, ডাক্তার, যুদ্ধ ও শান্তি, নির্বাচন, লোক গণন।,
65) রাজ্য তালিকার অন্তরভুক্ত বিষয় গুলি কী কী?
উঃ- পুলিশ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভূমিরাজস্ব, কৃষি।
(66), যুগ্ম তালিকার অন্তরভুক্ত বিষয়গুলি কী কী
, উ:- দেওয়ানি,, ফৌজদারি, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, শিক্ষা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, শ্রমিক কল্যান।
(67)ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট,--
উঃ (১)ভারতীয় য় যুক্ত রাষ্ট্রে অস্বাভাবিক কেন্দ্র প্রাণীর পরিলক্ষিত হয়।
(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভার তের নাগরিকদের দ্বি নাগরিকত্ব নেই।

(68)সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে?
উঃ- সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র বলতে সাধারণ ভাবে সেই যুক্তরাষ্ট্র কে বোঝায় যেখানে কেন্দ্রীয়সরকার ও রাজ্যসরকারের পরস্পরিক সহযোগীতাও বোঝাপড়া থাকে।

(69)ভারতীয় সংবিধানে 249 নং ধারায় কী বলা হয়েছে,?
উঃ- ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে, যে রাজ্য সত্তর উপস্থিত ও ভোট দানকারী সদস্যদের 2/3 সংখ্যা গরীষ্টতার যদি এমন প্রস্তাব নেওয়া হয় যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকা ভুক্ত বিষয় পার্লামেন্টের আইন "প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তাহলে সেই বিষয়ে পার্লামেন্ট আইনপ্রনয়ন করতে পারে।

১)সুপ্রিমকোর্টের বিচার পতিগন কীভাবে নিযুক্ত হন।
উঃ- সুপ্রিমকোর্টের বিচার পরিমল রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন,নিয়োগের আগে তিনি সুপ্রিয়াকোট ও হাইকোর্টের যেসব বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনেকরে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। তবে আগে যেখানে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজটি সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে তিনি এই কাজটি কলেজিয়াম নামক এক বিচার বিভাগীয় সমস্যার পরামর্শ অনুযায়ী।

(2)সুপ্রিমকোর্টের বিচার পতিদের কী ভাবে অপসারন করা যায়।
উঃ- প্রমাণিত অসদাচারণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের অধিকাংশ সদস্যের এবং উপস্থিত ও ভোটদান করি সদস্যদের ২/৩:অংশ সংখ্যালরীষ্টের ফোটে সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচার পতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হলে সেই প্রস্তাবারের ভিত্তিতে হাজ রাষ্ট্রপতি সেই বিচারককে পদচ্যুত করতে পারেন।

(3)বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচার পতির সংখ্যা কত ?
উঃ- বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা 1 জন প্রধান বিচার প্রতি সহ 34 জন। তবে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অস্বাস্থ্য বিচারক নিয়োগ করতে পারেন।
(4)প্রধান মন্ত্রী কীভাবে নিযুক্ত হন?
উঃ সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভায় যে দল ভোটার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল বা ভোটার দল নেতা বা নেত্রীকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন,
(5)কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় কয় প্রকার মন্ত্রীথাকে ?
উঃ-কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ও শ্রেণীর মন্ত্রী থাকে যথাঃ- (১) ক্যাবিনেট মন্ত্রী (২) রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত) এবং রাষ্ট্রপতি। তাছাড়া ধরার জন্য নানো সন্ত্রীসভার উপপ্রধান মন্ত্রী থাকে।

(6)প্রধান মন্ত্রীকে সমপর্যায় ভুক্ত অগ্রগণ্য বলা হয় কেন ?
উঃ- প্রধান মন্ত্রীকে সম্পর্যায় ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলার কারন ভারতের সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়নি। কোনো কারণে মন্ত্রীসভার যদি ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রধান মন্ত্রীর ভোটের মূল্য অন্য যে কোনো মন্ত্রীর ভোটের মূল্যের সমান।
(7)মন্ত্রীপরিষদের যৌথদ্ধায়িত্ব শীলতা বলতে কী বোঝায়,
উঃ- সংবিধান অনুসারে মন্ত্রী পরিষদকে লোবাস ভার কাছে যৌথভাবে দ্বায়িত্বশীল থাকতে হয়। এই নীতি অনুসারে মন্ত্রীসভাকে শাসন কার্য পরিচালনার ব্যাপারে যে কোনো ভুল ক্রুটির জন্য লোনসভার কাছে দায়ী থাকতে হয়। কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা সমগ্রমন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

(8) 86তম সংবিধান সংশোধান (২০০২) এর মাধ্যমে মৌলিক কর্তব্যে কী পরিবর্তন করা হয়েছে ?
উঃ- ২০০২ সালে প্রানীত 86 তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্য গুলির সংখ্য বাড়িয়ে 10 থেকে 11" করা হয়, সংবিধানে (গ) (ক) ধারা সঙ্গে (ক) উপধারটি যোগ করে বলা হয়, সমস্ত মাতা-পিতবা অভভকরের কর্তব্য হবে তাদের 6-14 বছর শিক্ষা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

(9)ভরতীয় সংসদের বা পালমেন্টর যেকোনো চারটি স্থায়ী কমিটির নাম লেখ।
উঃ-(১)আনুমানিক বর্তায় হিসাবে কমিটি
(2)সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিট
(৩) নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি,
(৪) বিশেষ অধিকার সম্পবিত কমিটি

(10) ভারতের পার্লামেন্ট কি সর্বভৌম?
উঃ-ভারতের পালামটকে সার্বভৌম আইন প্রশয়ন কারী সংস্থা বলা চলে না কারন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারেনা এবং পার্লামেন্ট প্রণীত কোনো আইন সংবিধান বিরোধী হলে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে। এক কথায় ভারতের গণ্ডির মধ্য থেকে আইন প্রণয়ন করতে হয় বলে এটি সার্বভৌম নয়।

(11)লেকে সভার অধ্যক্ষকে কীভাবে অপসারণ করা যায়?
, উঃ- লোকসভার অধ্যক্ষকে পদচ্যুত করতে হলে 15 দিনের নোটিশ দিতে হয়। অতঃপর অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পদচ্যুতির প্রস্তাব সদস্যদের অধিকাংশের দ্বারা সমর্থীত হলে তিনি অপসারিত হন।

(12) পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা কয় ধরনের কর্তিপক্ষ রয়েছে ও কী কী?
উঃ-তিন ধরনে কর্তৃ পক্ষ আছে। যথা:-
(১)পৌরসভা
(২)স-পরিষদের চেয়ার ম্যান,
(৩) চেয়ার ম্যান।

13.পঞ্চায়েত সমিতীর যে কোনো চারটি স্থায়ী সমিতির নাম লেখ?
উ:-(১) অর্থ ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি
(২)জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতী,
(৩)পূর্ত ও পরিবহন স্থায়ীসমিতী
(৪) কৃষি, সেচ, ও সমবায় স্থায়ী সমিতি।

14.গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মূল উদ্দেশ্য কি?
উঃ- গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মূল উদ্দেশ্য হল গ্রাম সংসদ দ্বারা নির্ধারিত প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা,
15.পৌর কর্পোরেশন কীভাবে গঠিত হয়?
উঃ-(১) ১৪৪ টি নির্বাচন এলাকা থেকে নির্বাচিত ১৪৪ জন কাউন্সিলার ,
(২) রাজ্য সরকার দ্বারা প্রণীত পৌর প্রশাসনের অভিজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তি।

2) অন্তঃরাজ্য পরিষদের দুটি কাজ লেখো?উঃ- (i) রাজ্যগুলির মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করা এবং সেই বিরোধের মিমাংসার জন্য পরামর্শ দেওয়া।
(ii) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় অনুসন্ধান করা ও তার বিশ্লেষণ করা।

(3) ভারতে কত ধরনের জরুরী অবস্থা দেখা যায় ও কী কী?
উঃ- ভারতে ৩ ধরনের জরুরী অবস্থা দেখা যায়।
(i) জাতীয় জরুরী অবস্থা (352) নং ধারা।
(ii) শ্বাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা (356) নং ধারা।
(৩) আর্থিক জরুরী অবস্থা (360) নং ধারা।

(4) ভারতের সংবিধানের পঞ্চম তালিকা ও ষষ্ঠতালিকা দুটি পার্থক্য?
উঃ (১) পঞ্চম তপশিলিটি উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া ভারতের অন্য ১০ টি রাজ্যের কোনো জেলা বা কোনো অংশে প্রযোজ্য হয়ে থাকে না, রাজ্যগুলি হল- অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজ্যস্থান ,গুজরাট, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা ,ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা। অন্যদিকে ষষ্ঠ তালিকাটি চারটি রাজ্যের অংশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চারটি রাজ্য হলো -মেঘালয় ,আসাম ,ত্রিপুরা, মিজোরাম।
(২) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত তপশিল রপ্ত অঞ্চল গুলি বিচার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ক্ষমতার লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে ষষ্ঠ তপশিলি উপজাতি অঞ্চলের রাজ্য সরকারের প্রযোজ্য।

(৫) ভারতে পঞ্চম তালিকাভুক্ত উপজাতি রাজ্য গুলির নাম?
উঃ পঞ্চম তালিকা অনুসারে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, মেঘালয় ,ত্রিপুরা ও মির্জোরাম ছাড়া অন্য যেকোনো রাজ্য উপজাতি এলাকাগুলোকে এই তালিকাভুক্ত অঞ্চল বা এই তালিকা গুলি কে উপজাতি অঞ্চল বলা হয়।

1. ভারতের সংবিধানের প্রদত্ত নাগরিকদের সাম্যের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা কর?

উঃ -ভারতের সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায় ১৪ নং ধারায় থেকে ১৮ নং ধারায় সাম্যের অধিকার প্রদত্ত হয়েছে। সাম্যের অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাদি ভাবে সম্পর্কিত, প্রকৃতপক্ষে সাম্যের ধারণার উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্ভর করে। তবে সাম্যের ধারণার একটি জটিল ধারণা। সাম্য বলতে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার স্বীকৃতি বোঝায় না। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির গুণগত মান ও নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। আবার জানিতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। সমতা বলতে তাই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ও সমানুপাতিক সূচক সুবিধার স্বীকৃতি কে বোঝায়। প্রত্যেক নাগরিকের অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তার প্রদান হলো সাম্যের প্রকৃত ধারণা। এই ধারণায় পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের নাগরিকদের সাম্যের অধিকার আলোচিত হয়েছে।

সাম্যের এই ধারণা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের যে আদর্শ গৃহীত হয়েছে তা বাস্তব রূপায়ণের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন। কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভাব ধারণার প্রভাবিত ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের তালিকায় সাম্যের অধিকার মূলত সামাজিক ও আইনগত অধিকার রূপে বর্ণিত হয়েছে

ভারতের সংবিধানের ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে - "The state shall not deny to any person equality before the law or the caual protection of law quithin the territory of India" —অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে আইনের চোখের সমতা এবং আইনের দ্বারায় সমভাবে সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এখানে state বা রাষ্ট্র বলতে কেন্দ্র ,রাজ্য ও স্থানীয় সকল প্রকার সরকারকে বোঝানো হচ্ছে। এই ধারা অনুসারে আইনের চোখে সমতা এবং আইনের দ্বারায় সমভাবে সংরক্ষণ এই দুটি ধারণার সন্নিবেশ হয়েছে। ইংল্যান্ডের সংবিধানের আইনের অনুশাসনের ধারণা থেকে আইনের চোখে সমতা ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্দশা সংশোধনের কাছ থেকে ভারতের সংবিধান প্রনেতা গণ আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষণের ধারণাটি গ্রহণ করে ছিলেন। এই দুই ধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বিচারপতি বলেন যে আইনের চোখের সতা হলো একটি নেতিবাচক ধারণা। কিন্তু আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষণ হলো একটি ইতিবাচক ধারণা।

আইনের চোখে সমতা বলতে বোঝায় যে, কোন ব্যক্তি আইনের উর্ধ্বে নয়। পদমর্যাদা নির্বিশোষে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সাধারণ আদালতে দ্বারা বিচার্য হবে। তবে এই নীতির কিছু ব্যতিক্রম ভারতের সংবিধানের স্বীকার করা হয়েছে।

প্রথমত::---36 নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল গণ তাদের কর্তব্য পালন ও ক্ষমতার ব্যবহারের জন্য আদালতের কাছে দায়ী থাকবেন না।

দ্বিতীয়তঃ–রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল গণ যতদিন নিজ পদে থাকবেন ততদিন তাদের ফৌজদারী মামলার অভিযুক্ত করা যাবে না। অথবা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

তৃতীয়তঃ—বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত গন এই নীতির প্রয়োগ থেকে বাইরে থাকবেন।

আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষণের অর্থ হল সমান পরিস্থিতিতে আইনের ব্যবস্থা হবে সমান সমপর্যায়ে ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আইনগত কোনো বৈষম্য থাকবে না। চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী Vs ভারত সরকার মামলার সুপ্রিম কোর্ট এই অধিকার কে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার হলো একই পরিস্থিতিতে অবস্থিত সকল ব্যক্তির সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার। তবে এই আবিষ্কার ও চরম অধিকার নয়। হরনাম সিং মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত শ্রেণীবিভাজন নিষিদ্ধ নয়। তবে এই যুক্তি জনমত শ্রেণীবিভাজন এরূপ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যাতে সকলে এই বিভাজনের ভিত্তি বুঝতে পারে।

সংবিধানে 15 নং ধারাতে বলা হয়েছে যে,ধর্ম ,বর্ণ ,জাতি ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্র কারুর ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। ধর্ম ইত্যাদি ভিত্তি দোকান, হোটেল, সিনেমা বা কূপ, জলাশয়, রাস্তা, পার্ক বা আশ্রয়স্থান ব্যবহারের বিষয়ে কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্য মূলক আচরণ করা চলবে না। তবে রাষ্ট্র মহিলা, শিশু ও তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে তার জন্য সংবিধানের সংশোধন করা হয়েছিল। এই সংশোধন মাদ্রাজ Vs চম্পকন এবং মাদ্রাজ Vs শ্রেণিনির্বাসন মামলায় ফলে করতে হয়েছিল। এইসব ক্ষেত্রে প্রভেদমূলক আচরণ করলেও সাম্যের অধিকার ক্ষুন্ন হয় না।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও সমানধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৬ নং ধারা অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্যের জন্য কোন ব্যাক্তি রাষ্ট্রের অধীনস্ত কোনো পথ লাভের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে না। তবে এই নিয়মে কিছু ব্যতিক্রম আছে যথা:--

প্রথমত:--কোন রাজ্যের অধীনস্ত কয়েকটি বিশেষ ধরনের চাকরির জন্য সেই রাজ্যের বসবাস অন্যতম শর্ত হিসাবে পার্লামেন্ট কর্তৃত্ব আরোপিত হতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যে যাতে তাদের খেয়াল খুশিমত বসবাসগত যোগ্যতার স্থির করতে না পারে সেই জন্য এই যোগ্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব পার্লামেন্টের হাতে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত:--সরকার যদি মনে করে যে কোন সরকারি চাকরি তে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের যথেষ্ট সংখ্যা নিযুক্ত হয়নি তবে সে ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য কিছু সরকারি চাকরির সংরক্ষিত করে রাখতে পারে।

তৃতীয়ত:--ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরির ক্ষেত্রে সরকার ওই চাকরি শুধু ধর্মের লোকেদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারে।

চতুর্থত:--শাসন বিভাগের দক্ষতা হ্রাস না করে সরকার তপশিলি জাতীয় উপজাতিদের জন্য সরকারি চাকরির পাওয়ার বিশেষ অধিকার স্বীকার করে নিতে পারে।

ভারতীয় জনজীবনের একটি দুর্গ ব্যাধি হলো অসপৃষ্টতা। অস্পৃশ্যতা ও সাম্যের অধিকার কখনোই পাশাপাশি থাকতে পারে না। এর জন্য সংবিধানের ১৭ নং ধারায় অসপৃষ্টতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অসপৃষ্টতার জন্য কোন নাগরিকের কোন সুযোগ-সুবিধা থেকে বনিৃত করা হলে তাকে আইন অনুসারে দন্দনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোন বিদেশী ভারতের কর্মরত থাকার সময় বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন উপাধি নিতে পারবে না। কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশের কাছ থেকে কোন উপাধি নিতে পারবে না। প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যায় হাজার ১৯৫৪ সাল থেকে বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মান দেওয়ার জন্য ভারত সরকার পদ্মশ্রী ,পদ্মভূষণ ,পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন উপাধি প্রদান করেন। অনেকে এই সম্মান বিতড়নকে সাম্যের অধিকারের বিরোধী বলে মনে করেন। তাই একসময় এই ধরনের সম্মান বিতড়ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পরে আবার এই সম্মান দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এই সম্মান দানের পক্ষে বলা হয় যে এগুলি উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এবং সমাজে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করে না।

ভারতের সংবিধানের সাম্যের অধিকার হিসাবে যে অধিকার গুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই অধিকার গুলি প্রকৃতিমূলত; সামাজিক ও রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা এই মৌলিক অধিকার নেই। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই ভারতীয় সমাজে যতদিন না পর্যন্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যাবে ততদিন সামনের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না।

2. আইনের চোখে সমান বলতে কী বোঝো,?

উঃ –ভারতের সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায় ১৪ নং ধারা থেকে 18 নং ধারায় সাম্যের অধিকার প্রদত্ত হয়েছে। সাম্যের অধিকার গণত্রান্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে সাম্যের ধারণার উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্ভর করে। তবে সামনের ধারণা একটি জটিল ধারণা। সাম্য বলতে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা স্বীকৃতি প্রদান কে বোঝায় না। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির গুণগত মান ও নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। আবার গাণিতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। সমতা বলতে তাই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ও সমানুপাতিক সুযোগ ও সুবিধা ও স্বীকৃতিকে বোঝায়। প্রত্যেক নাগরিকের অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিয়মতা প্রদান হলো সাম্যের প্রকৃত ধারণা। আবার আইনের চোখে সমতা বলতে কোন ব্যক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয়। অর্থাৎ পদমর্যাদা নির্বিশেষে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দেশের সাধারণ আইনের দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত হবে।। তাই বিচারপতি শুব্বারাও বলেন যে, আইনের চোখের সমতা হল একটি নেতিবাচক ধারণা।

3. প্রস্তাবনা গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা কর?

উঃ –1787 সালে মার্কিন সংবিধানের সর্বপ্রথম যে প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ চুক্তি করা হয় তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে রচয়িতা দের প্রভাবিত করেছিল। জাপান, আয়ারল্যান্ড, মায়ানমার, ভারত প্রকৃতি দেশের এই পদক্ষেপ অনুসরণ করে। সংবিধান হলো দেশের মৌলিক আইন। প্রতিটি আইনের সঙ্গে একটি প্রস্তাবনা যুক্ত থাকে। সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে একটি সংবিধানের আদর্শ, দর্শন, লক্ষণ ও উদ্দেশ্যকে অল্প কথায় তুলে ধরা হয়। তাই প্রস্তাবনা কে সংবিধানের বিবেক বা conscience of the constitution বলা হয়। অনেকে প্রস্তাবনাকে সংবিধানের আত্মা বা

Soul of this constitution বলে থাকে, কারণ, প্রস্তাবনা সংবিধানের গতি প্রকৃতি নির্দেশ করে। সুতরা, ভারতের সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা সংযোজিত হয়েছে। কেশবানন্দ ভারতী বনাম কিরল রাজ্য মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেন, প্রস্তাবনা ভারতীয় সংবিধানের যেসব প্রাথমিক উপাদান বা মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা কোনভাবেই, এমনকি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেও রখবদল করা যায় না।

প্রস্তাবনার যেহেতু সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু এর আইনগত কোন মূল্য নেই-এক কথায় অনস্বীকার্য। বেরুবাড়ি সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবে নাকি সংবিধানের কার্যকারী অংশ হিসেবে গণ্য করা যায় না। সংবিধানে মূল অংশে সঙ্গে প্রস্তাবনার বিরোধ বাধলে সংবিধানের মূল অংশেই বলব থাকে। অর্থাৎ আদালত সংবিধানের মূল অংশকেই গ্রহণ করে থাকে। প্রস্তাবনা কি নয়। গোপালন বনাম মাদ্রাজ মামলা সুপ্রিম কোর্ট অনুরূপভাবেই এই মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রস্তাবনায় ভিত্তিতে আইনের অর্থ ব্যাখ্যা করা হলে গ্রাহ্য হবে না। এই প্রসঙ্গে দুর্গাদাস বসুর অভিমত হল, সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় সাধারণ উদ্দেশ্য প্রস্তাবনার মধ্যে প্রতিফলিত হলেও একে কখনোই সংবিধানের অংশ বলে অভিহিত করা যায় না।

তবে আইনগত দিক থেকে প্রস্তাবনার কোন গুরুত্ব না থাকলেও এর ব্যবহারিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য কে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সংবিধানের মাধ্যমে যে সামাজিক শক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, প্রস্তাবনার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি ঘটে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন, তারই সুপষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে প্রস্তাবনায়। প্রস্তাবনার মূল তাৎপর্য হলো:-----

(১) প্রস্তাবনা সংবিধানের উৎস ও নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে।

(২) আইনের কোন ধারা অর্থ উদ্ধারের জন্য প্রস্তাবনার সাহায্য প্রদান করা হয়.।

(৩) প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, কার্যকরী অংশের কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট না থাকলেও প্রস্তাবনার সাহায্য না পরিস্কার করে নেওয়া হয়। তাই ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গোপালন বনাম মাদ্রাজ মামলায় বলেছেন যে, সংবিধানের প্রস্তাবনা কে অনুসরণ করে সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে হবে। কেশবানন্দ ভারতীয় মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় এই মত প্রকাশ করে যে, প্রস্তাবনের যে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো ভারতের সংবিধানের কাঠামোগত ভিত্তি।

(৪) প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের উদ্দেশ্য ও নীতির নির্যাস নিহিত থাকে। অর্থাৎ যেসব কিছু সামাজিক , রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার সংবিধান রচয়িতাদের অনুপ্রেণীত করেছিল সেগুলি প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া সংবিধানের পিছনে যে মূল্যবোধ, ভাব ও আদর্শ থাকে তার প্রকাশ প্রস্তাবনার মধ্যে পাওয়া যায়।

(৫) ভারতীয় সংবিধানে প্রস্তাবনার পাঠ করলে সংবিধানটি কবে গৃহীত হয়েছিল সেটি পর্যন্ত জানা যায়।

(৬) প্রস্তাবনা আমাদের সংবিধান রচয়িকাদের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে। সংবিধানে কোন একটি অংশ অপ্রষ্ট থাকার তা অর্থ বুঝতে না পারা গেলে পস্তাবনার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ বলে কি স্বীকৃত নয়। প্রস্তাবনা আদালত গাহ্য নয়। অথবা আদালত কর্তৃত্ব বলবত যোগ্য নয়। যদিও বিচারপতি স্টোরি প্রস্তাবনা কে সংবিধানের চাবিকাঠি বলে অভিনীত করেছেন তবুও উপস্থাপনা কখনোই সংবিধানের লিখিত অংশের উর্দ্ধে নয়। আবার সংবিধানের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না থাকলেও প্রস্তাবনার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় সংবিধানের দর্শন ও লক্ষ্য কি হবে সে সম্পর্কে জহরলাল নেহেরু একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ভারতের গণপরিষদ এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। এই দর্শন ও লক্ষ্য অনুযায়ী ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার রচিত হয়। সংবিধানের মূল দলিলে যেভাবে প্রস্তাবনাটি ছিল ১৯৭৬ সালে 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তা কিছু পরিবর্তন করা হয়।

সংবিধানের মূল দলিলে ভারতকে একটি সার্বভৌম ,গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু ৪২ তম সংশোধনের আরও দুটি শব্দ সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রস্তাবনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এছাড়াও ব্যাক্তি মর্যাদা ও জাতির ঐক্য এই শব্দ দুটির সঙ্গে সংহিতির শব্দটি যুক্ত করে ভাতৃত্ববোধ জাগরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রস্তাবনা টি হল:-"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণত্রান্তিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে; চিন্তা ও মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার সুনিশ্চিত করতে; অবস্থা ও সুযোগের সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহিতির সুনিশ্চিত করার

জন্য সৌভ্রাতৃত্বের প্রসারকালে আজ ১৯৪৯ সালে ২৬ শে নভেম্বর সত্য মিষ্টার সঙ্গে সংকল্প নিয়ে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছে।

১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার ভারতকে একটি সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র বলতে উপাদানের উপকরণ গুলি ওপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদিত সম্পদের সমবন্টন কে বোঝায়। কিন্তু ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেই অর্থ সমাজতান্ত্রিক শব্দটি সংযোজিত হয়নি। ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ভারতের সমাজতন্ত্রের ধারণা সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের সমাজতন্ত্রের ধারণা থেকে পৃথক। ভারতে যাবতীয় বৈষম্যর অবসান ঘটিয়ে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পটভূমিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতের একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। প্রস্তাবনার প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি যুক্ত ছিল না। এই শব্দটি ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনা যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের মূল আদর্শ যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ তার স্বীকৃতি সংবিধানের অন্য অনেক অংশে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ কি আরও সুস্পষ্ট করার জন্য আইনগতভাবে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্র এখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রীয় কোন বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধিতা কোনটাই করেনা।

প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক বলতে এমন এক গণতান্ত্রিক কে বোঝায়, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী জনগণের দাঁড়ায় নির্বাচিত হন। সুতরাং গণতন্ত্র ও পজাতন্ত্র সমার্থক শব্দের পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধান রচয়িতাগন এই দুটি শব্দকে পৃথক অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করে তারা ভারতের রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় তারা ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেছেন।

প্রস্তাবনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান রচয়িতারা সম্যক ভাবে অবহিত ছিলেন যে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা না হলে সমস্ত অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সেই কারণেই এগুলি প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। প্রস্তাবনার এই আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে মূল সংবিধানে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার গুলি কে স্বীকৃতি দিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংকল্প দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে।

মূল্যায়ন:----

ভারতের সংবিধান অতি সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের আদর্শকে তুলে ধরেছে। ভারতের প্রস্তাবনার মৌলিকত্ব অসাধারণত্বে মুগ্ধ হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যাপক বার্কার তার দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিকাল থিওরি পুস্তকে আদর্শ প্রস্তাবনা হিসাবে ভারতের প্রস্তাবনা কে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক গ্যানভিল অস্টিন বলেছেন যে, ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে দিয়ে সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায় ও ভাতৃত্ববোধের মহান আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। পন্ডিত হৃদয়নাথ কঙ্গরু যথাযথই বলেছেন যে,it is a gen to our constitution .

4. ভারতের সংবিধান প্রণয়নের গণপরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর?

উঃ –গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে একটি সংবিধান রচনার কাজ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের নিঃসন্দেহের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা রচিত হবে-এ ধরনের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামীদের দ্বারা উচ্চারিত হয়ে আসছিল। যুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতের সমকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং কেবিনেট মিশনের সদস্যদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতের গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে 15ই মে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে ভারতীয় গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ।এই নীতিগুলি হল:--

(১) ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী গণপরিষদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা।

(২) গণপরিষদের সমস্ত আসন সাধারণ, মুসলিম ও শেখ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হার অনুযায়ী বিভক্ত করা.
(৩) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারায় একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট অধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা.।
(৪) লোক সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী গণপরিষদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ৯৩ জন প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ দেওয়া.।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদের মোট সদস্যে সংখ্যা স্থির করা হয় ৩৮৯ জন। এর মধ্যে২৯২ জন সদস্য ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ গুলি থেকে নির্বাচিত হবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবার, এই ২৯২ টি আসনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য ৭৮ টি, শিখদের জন্য চারটি এবং সাধারণের জন্য ২১০ টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। এছাড়া স্থির হয় চারজন সদস্য আসবে চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ গুলি থেকে এবং অনধিক ৯৩ জন সদস্য আসবেন দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে জুলাই মাসের গণপরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চিফ কমিশনার শাসিত স্বদেশগুলির চারটি আসন সমেত ব্রিটিশ ভারত থেকে মোট ২৯৬ জন প্রতিনিধির নির্বাচনের জন্য গনপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯২ টি প্রাদেশিক আসনের মধ্যে কংগ্রেস সদস্যরা ২০৮ টি আসন লাভ করে। মুসলমান এদের জন্য নির্দিষ্ট আসন গুলির মধ্যে ছাত্রী ছাড়া বাকি সবগুলিতে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে। এছাড়া কংগ্রেস গণপরিষদের চারজন মুসলমান ও একজন শিখ প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। বাকি আসন গুলিতে জয়লাভ করে কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও নির্দল প্রার্থীরা। অর্থাৎ গণপরিষদের নির্বাচনের কংগ্রেস ৬৯ পার্সেন্ট আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে একটি গণপরিষদ কর্তৃত্ব সংবিধান রচনার দাবি ও সমান গুরুত্ব পায়। কারণ, এই গণপরিষদের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর রুপলেখা স্থির করা যাবে বলে ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল। ভারতের গণপরিষদের যেসব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে তাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ভারতের সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির হয়। কিন্তু গণপরিষদের যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সকলের ধ্যান-ধারণা একই রকম ছিল না। সেই কারণে তিনটি ধারা লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রথম ধারাটি হল রক্ষণশীল। তিনি গণপরিষদের সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যা অধিকাংশই সংবিধানের স্থান পেয়েছিল,তার মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্টা, প্রত্যেকের সমান সূচক ও মর্যাদা লাভ, কর্মের স্বাধীনতা প্রভৃতি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শ গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তৃতীয় ধারা প্রতিনিধিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা পালনের কোন সুযোগই ছিল না।

ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থাপতি ডক্টর আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র না থাকলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাছাড়া সমস্ত রকম বৈষম্যের অবসান, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সকলের জন্য সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, অসপৃষ্টতার বিলোপ, অনগ্রসর শ্রেণীর বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, শোষণের অবসান, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি আদর্শ গুলি সংবিধানের বিভিন্ন অংশের স্থান পেয়েছে।

এরই ফল প্রতিশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারত বিভক্ত ও স্বাধীন হয়। ভারতীয় গণপরিষদ আইনগত দিক থেকে সার্বভৌম পরিষদের রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৬ সালের ৯ থেকে ২৩ শে ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। মুসলিম লীগের সদস্যরা এই অধিবেশনে যোগ্ দেননি। এই অধিবেশনে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের প্রথম স্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র বলে উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশন ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২ রা মে পর্যন্ত চলে। এই অধিবেশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠিত হয়, যথা:-(১) কেন্দ্রীয় সংবিধান সম্পর্কিত কমিটি; (২) প্রাদেশিক সংবিধান সম্পর্কিত কমিটি। প্রথম কমিটির সভাপতি হলেন পন্ডিত নেহেরু, অন্যদিকে দ্বিতীয় কমিটির সভাপতি হলেন সদা বল্লভ ভাই প্যাটেল।

১৯৪৭ সালের ১৪ থেকে ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা স্থির করা হয়। ইতিমধ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসর পদে যোগ দেওয়ার পর

ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর পূর্ণ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে।

সুতরাং খসড়া কমিটির ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধান রচনার কাজ আরম্ভ করে। এই খসড়া সংবিধানের ৩৫১ টি ধারা এবং ১৩ টি তপশিলি ছিল। পরবর্তীকালে চূড়ান্তর ভাবে সংবিধানের ৩৯৫ টি ধারা ও আটটি তপশিলি অনুমোদিত হয়। তবে বিভিন্ন সময় সংবিধান সংশোধনের ফলে বর্তমানে জাতীয় সংবিধানের মোট ধারা প্রায় 450 টি এবং তপশিলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ টি। পরিশেষে ১৯৪৯ সালে ২৬ শে নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের ২৪ শে জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫০ সালে ২৬ শে জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়।

মূল্যায়ন:-
স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান রচনার কাজ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কারণ, এই কাজে মধ্যে দিয়েই প্রমাণ হয়েছে যে, ভারতীয় জনগণই ভারতের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে যে গণপরিষদ গঠিত হয় তা গঠন ও কার্যের প্রকৃতি বিষয়ে নানা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হয়।।

(১) গণপরিষদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো গণ চরিত্রের ঘাটতি। কেননা, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হননি তাই এতে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। অর্থাৎ গণপরিষদের সমস্ত জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না। (২) গণপরিষদের সমাজের উচ্চবিত্ত ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব সবথেকে বেশি ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এখানে কোন মর্যাদা পায় নি।
(৩)____গতভাবে গণপরিষদ সংবিধান রচনার প্রধান কার্যক্ষেত্র হলেও প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ছিল এর মূল স্রষ্টা।
(৪) অধ্যাপক জোহারির মতে গণপরিষদের সংবিধানের খসড়া আলোচনার সময় পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ছিল একটি অন্যতম ত্রুটি। সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল করার ক্ষেত্রে সভাপতি-র হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকার সাধারণ সদস্যদের মতামত বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।

(5) ভারতীয় পার্লামেন্ট বা সংসদের অর্থবিল কিভাবে পাস হয়?

উঃ –ভারতীয় পার্লামেন্ট অর্থ বিল পাসের পদ্ধতি সম্বন্ধে ১০৯ নং ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে রয়েছে যথা:--
(১) অর্থবিল শুধুমাত্র লোকসভাতে উপস্থাপন করা যায় , রাজ্যসভার কোনো অর্থ বিল উপস্থাপন করা যায় না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ক্রমে শুধুমাত্র মন্ত্রীরা এই অর্থ বিল উপস্থাপন করেন। সাধারণ বিল পাশের জন্য প্রতিটি বিল কে যেভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ কমিটি পর্যায়, তৃতীয় পাঠ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অনুরূপভাবে অর্থবিল এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটে থাকে।

(২) অর্থবিল লোকসভায় গৃহীত হলেও তা রাজ্যসভায় কাছে সুপারিশের জন্য পাঠানো হয়। অর্থবিল কে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করার কোন ক্ষমতা রাজ্যসভার নেই। রাজ্যসভা কে ১৪দিনের মধ্যে অর্থবিল সুপারিশ সহ লোকসভায় পাঠিয়ে দিতে হয়। যদি ওই সময়ের মধ্যে বিলটি ফেরত না আসে তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে পার্লামেন্টে বিলটি গৃহীত হয়েছে।

(৩) পার্লামেন্টে অর্থবিল গৃহীত হওয়ার পর তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি কোন অর্থবিলকে পুনর বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের ফেরত পাঠাতে পারেন না। অর্থ বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের মত।

(6) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার বলতে কী বোঝো?

উঃ - ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি মৌলিক অধিকার গুলিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানে ৩২ নং এবং ২২৬ নং ধারায় দুটিতে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকার কখনো ক্ষুন্ন হলে নাগরিক গণ সংবিধানে ৩২ নং ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে এবং ২২৬ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে।

মৌলিক অধিকার গুলি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট পাঁচ ধরনের আদর্শ বা নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে যথা:-

(১) বন্দীপ্রত্যক্ষীকরন:--কি কারনে আটক করা হয়েছে তা জানবার জন্য আদালত এই প্রকার আদেশ জারি করে, আটক ব্যক্তিকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করতে হুকুম দিতে পারে এবং আটক আইন সংগত না হলে সেই ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

(২) পরমাদেশ:--

পরমাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অধস্তন আদালত বা সরকারকে নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) প্রতিষেধ:--এই আদেশের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোন অধস্তন আদালতে কে নিজস্বীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দিতে পারে।

(৪) অধিকার পৃচ্ছা:--এই লেখক বা নির্দেশের সাহায্য আদালত ও অনুসন্ধান করে দেখে যে কোন ব্যক্তিকে যে পদে নিযুক্ত করা হয়েছে যে সেই পদের যোগ্য কিনা; যোগ্য না হলে আদালত সেই নিয়োগ বাতিল করে দিতে পারে।

(৫) উৎপ্রেষণ:--নিম্নতম কোন আদাল ত আইনগত সীমা লংঘন করলে সেই আদালত থেকে বিচার বিষয় কে উদ্ধতন আদালতের হাতে অর্পণ করার জন্য উদ পেছনে সাহায্য নেয়া হয়।

তবে অন্যান্য অধিকারের ন্যায় শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার টিও অবাধ নয়। কেননা জরুরি অবস্থা চলাকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের মৌলিক অধিকারের এই ক্ষমতাকে স্থগিত রাখতে পারেন। আবার ভারতের কোন অঞ্চলের সামরিক শাসন প্রবর্তিত থাকলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কারণে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার বিরোধী কাজকে পার্লামেন্ট দন্ড নিষ্কৃতি আইন অনুসারে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে।

(7) অর্থবিল কাকে বলে?

উঃ –সংবিধানে ১১০ নং ধারায় রাজ্য অর্থ বিলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখিত সাতটি বিষয় বা তার মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত বিল কে অর্থবিল বলা যায়। এই 7টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:---

(১) কোন কর ধার্য, বিলোপ, প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ।

(২) রাজ্য কর্তৃক খনন গ্রহণ বা কোন প্রতিশ্রুতি প্রধান বা রাজ্য সরকার কর্তৃত্ব গৃহীত হবে এমন কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন।

(৩) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের অর্থ প্রধান বা প্রত্যাহার।

(৪) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের অর্থে বিনিয়োগ।

(৫) কোন ব্যয় কে সঞ্চিত তহবিলের ব্যয় বলে ঘোষণা বা সঞ্চিত তহবিল এর ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি.।

(৬) রাজ্যে সঞ্চিত তহবিলের অর্থ প্রাপ্তি বা এই অর্থের তত্ত্বাবধান।

(৭) উপরিরুক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়।

সংবিধানে ১৯৯ (২) নং ধারায় অনুযায়ী অর্থে সঙ্গে সম্পর্কিত থাকলেও তাকে অর্থবিল বলা যাবে না। জরিমানা বা অন্য কোন অর্থদণ্ড ধার্য, লাইসেন্স বা কোন প্রকার সেবামূলক কাজকর্মের জন্য ধার্য কি বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার দ্বারা স্থানীয় উদ্দেশ্যে কর স্থাপন, বিলোপ, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিল অর্থ বিলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না।

সংবিধানে ১৯৯(৩) নং ধারায় একথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে কোনো বিল অর্থ বিল কিনা এই নিয়ে মতোবিরোধ দেখা দিলে রাজ্য বিধানে সভায় স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। প্রতিটি অর্থ বিলের জন্য স্পিকার একটি প্রমাণ পত্র দিয়ে থাকেন।

রাজ্য আইনসভায় অর্থ বিলের পাশের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলি হল:--

(১) অর্থবিল শুধুমাত্র রাজ্য বিধান সভাতেই উত্থাপন করা যায়। বিধান পরিষদের কোন অর্থবিল উত্থাপন করা যায় না। অর্থবিল একমাত্রই সরকারি বিল। এই কারণে বিধানসভায় কোন সাধারণ সদস্য এই বিলটি উত্থাপন করতে পারেন না। রাজ্যপালের সুপারিশে শুধুমাত্র মন্ত্রীরা এই অর্থ বিল অধ্যাপন করে থাকেন।
(২) অর্থবিল বিধানসভায় গৃহীত হলে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তা সুপারিশের জন্য রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদের পাঠানো হয়। তবে বিধান পরিষদের অর্থ বিল সম্পর্কে তা সুপারিশ বিধানসভায় পাঠাতে পারে। এই সুপারিশ সহ ১৪ দিনের মধ্যে অর্থবিল টিকে বিধানসভায় পাঠিয়ে দিতে হয়। এবং সেটি সরাসরি রাজ্যপালের সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
(৩) রাজ্য আইনসভার গৃহীত হওয়ার পর অর্থ রাজ্যপালের সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাজ্যপাল অর্থবিল কে পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য আইনসভায় ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারেনা।

(৪)ধর্মনিরপেক্ষতার মূল দিকগুলির সম্পর্কে আলোচনা কর? অথবা, ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বৈশিষ্ট্য গুলি কি কি সে সম্পর্কে আলোচনা কর?

উঃ -ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য:--
(১) ধর্মীয় ও ধর্ম প্রভাবিত রাষ্ট্রের ধারণাকে বর্জন করে গণতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তোলা।
(২) ধর্ম এখানে একান্ত ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত বিষয়, এই ধর্মের উপর ভিত্তি করে কোন রাষ্ট্র কোনভাবে কোন ব্যক্তির সঙ্গে বৈষম্য মূলক আচরণ করবে না।
(৩) সমধর্মের প্রতি সম মনোভাব প্রদর্শন করা এর মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সব ধর্মের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নীতি ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে।
(৪) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিয়ে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করেছে।
(৫) সংবিধানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা ফলে ভারতের জন্য কল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। জনকল্যাণকর ধারণাটি প্রকৃতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ।
(৬) ভারতের ধর্ম কিংবা জাত পাত নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণাটি গান্ধীবাদী ও নেহেরু বাদী ধর্মনিরপেক্ষতার সমন্বয় সাধনের ফল মাত্র।

(1) রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা কি?

উঃ- রাষ্ট্রপতির বিল বাতিল করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতা হিসাবে পরিচিত। এই ভিটো ক্ষমতা তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(i) চরম ভিটো :- অর্থবিল বা সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়া অন্য যে কোনো বিলে অসম্মতি জানানোর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে। রাষ্ট্রপতি অসম্মতি জানালে বিলটি বাতিল বলে গণ্য হয় একে রাষ্ট্রপতির চরম ভিটো বলে,

(ii) স্থগিত কারী ভেটোঃ- পার্লামেন্টে পাশ হওয়া কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি যখন সরকারি সম্পতি বা অসম্মু না জানিয়ে পুনরায় বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেয় তখন তাকে স্বগীত কারী ভেটো বলে।

(iii) পকেট ভেটো:- পার্লামেন্টে কোনো বিল পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির কাছে এলে তাতে সম্মতি জানাবো বা অসম্মতি জানানোর জন্য পুনরার পার্লামেন্টের কাছে বিলটি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবিধানে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। পরে রাষ্ট্রপতি বিলটিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিলটিকে আটকে রাখতে পারেন। এই ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির পকেট ভেটো বলা হয়।

2) সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কী বোঝো?

উঃ- বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার ক্ষমতাটি মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট থেকে উদ্ভুত হয়। তবে ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা কোনো মতে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের মত নয়। মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট আইনের যথাবিহীত পদ্ধতি অনুসারে এটি দেখে যে আইনটি যথাযথ সংবিধানিক পদ্ধতি অনুসরন করে তৈরি হয়েছে কিনা। সেই সঙ্গে আইনটি ন্যায়নীতির বিরোধী কিনা। ভারতের সুপ্রিমকোর্ট শুধু এইটুকু দেখয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আইন কোনো নির্দেশ, সন্ধি বা চুক্তি সংবিধানের

আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তৈরি হয়েছে। কিনা, আইন বিভাগের আইন শাসন বিভাগের নির্দেশ যদি সংবিধান বিরোধী হয় তাহলে সেটি অসংবিধানিক বলে বিচার বিভাগ বাতিল বলে ঘোষনা করতে পারে, এই বাতিল করার ক্ষমতাকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা। এই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা:-

(1) আইনটি উপযুক্ত কার্তিপক্ষ দ্বারা রচিত হয়েছে কিনা।
(2) আইনটি অসংবিধানিক কিনা।
(3) অর্থ- সামাজিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি অনুযায়ী আইনটি ব্যাখ্যা বা বিচার ধারা হয়েছে কিনা।
(4) মৌলিক প্রকৃতি অনুসারে আইনটি পর্যালোচনাকরা হয়েছে কিনা তা দেখা হয়।

3) ভারতীয় নাগরিক দের মৌলিক কর্তব্য সমূহ আলোচনা করো ?

উঃ- ভারতের মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের কোনো উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তি কালে 1976 সালে 42তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সংবিধানে অন্তরভুক্ত করা হয়। সংবিধানে চতুর্থ অংশে 51 নং ধারায় এবং ক নং উপধারার সংযোজন হলে Part IV (A) নামে নতুন একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়। এই ধারায় নাগরিকদের জন্য মোট ১০ টি মৌলিক কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।2002 সালে 86তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 51 (ক) নং ধারায় নতুন একটি কর্তব্য সংযোজিত হওয়া বর্তমানে মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 11টি। এই কর্তব্য গুলি হল –

(1) সংবিধানকে মেনে চলা এবং সংবিধানের আদর্শ, সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা,

(২) যেসব আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরনা দিয়েছিল সেগুলিকে রক্ষা করা এবং অনুসরণ করা
(3) ভারতে সার্বভৌমত্ব,ঐক্য, সংহতীর প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করা এবং এগুলি সংরক্ষণ করা,
(4) দেশরক্ষা ও সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসা,
(5) ধর্ম, ভাষা, এবং অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্দ্ধের উঠে ভারতীয় দের মধ্যে একতা ও সৌভ্রাতৃত্ব বাড়ানো এবং নারীর মর্যদা হানী কর প্রথা গুলিকে ত্যাগ করা,
(6) ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির ইতিহ্য কে মূল্য দেওয়া এবং সংরক্ষন করা।
(7) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রানী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষন করা এবং জীবন্ত প্রানীর প্রতি মমত্ত রোধ প্রকাশ করা,
(8) বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতা বোধ, সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গী প্রসার করা।

(4.)রাজ্যসভায় কে সভাপতিত্ব করেন ? কী ভাবে তিনি নির্বাচিতও পদচ্যুত হন?

উঃ- রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংবিধানে 63নং ধারা অনুযায়ী পদমর্যদার দিক থেকে রাষ্ট্রপতির পরে উপরাষ্ট্রপতির স্থান, রাষ্ট্রপতির মতে উপরাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচক মন্ডলীর দ্বারা নিযুক্ত হন। উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। তিনি অবশ্য পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন বা তিনি পদচ্যুত হতে পারেন।উপরাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচক সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের সদস্য নিয়ে এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত
হয় একক হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিদ্ধিত্বের ভিত্তিতে গোপন ভোটের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য 14 দিন আগে রাজ্য সভার নোটিশ দিতে হয়। তাঁর পদচ্যুতর বিষয়টি প্রস্তাবের রাজ্য সভায় উত্তাপিত করতে হয়। প্রস্তাবটি যদি রাজ্যসভার মোট সদস্যের দ্বারা গৃহীত হয় এবং লোক সভা যদি প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানায় তাহলে। উপরাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হয়।

(5) ভারতীয় সংবিধানে 19নং ধারায় স্বীকৃত ব্যক্তিগত ধারনাটি আলোচনা করো?

উঃ- ভারতীয় সংবিধানে 19নং ধারায় 6 ধরনের স্বাধীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে যথা:- (i) বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকার

(2)শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র ভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার
(3) সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার
(4) ভারতীয় ভূ-খন্ডের যে কোনো অঞ্চলে বসবাসের অধিকার
(5) যে-কোনো বৃত্তি ও পেশা ব্যবসাবানিজ্য
(6) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার

ভারতীয় সংবিধানে 19 (1) ক নং ধারা অনুযায়ী বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার অনুসারে নাগরিকরা নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেক, মতাদর্শ ও ধ্যান ধারনা অনুযায়ী লিখিত বা মৌখিক ভাবে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে তবে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা অপরাধ মূলক কাজে প্ররোচনা দেওয়া বন্ধ করা ইত্যাদী কারনে রাষ্ট্র বাক ও মতামত প্রকাশে যুক্তি সম্মত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে।

19 (1) (খ) নং ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরীক দের সমবেত হওয়ার অধিকার শিকার হয়েছে তবে জন শৃঙ্খলা, সার্বভৌমিকতা ও সংহতির স্বার্থে যে কোনো সমাবেশের উপর যুক্তি-সংগত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে।

19 (1) (গ) নং ধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিকরা যে কোনো সংঘ ও সমিতি স্বাধীনভাবে গঠন করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের নীরাপত্তার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

19 (1) (ঘ) নং ধারা অনুযায়ী সর্বত্র চলাফেরা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং জনস্বার্থে তপশিলি জাতি উপজাতীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে।

19 (1) (ঙ) নং ধারা অনুযায়ী ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনো অঞ্চলে বসবাস করতে পারে

19 (1) (ছ) নং ধারা অনুযায়ী যে কোনো বৃত্তি বা পেশাগ্রহণ বা ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার প্রতিটি নাগরিক হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু জনস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রন আরোপ করতে পারে।

(6) গণপরিষদের গঠন সম্পর্কে লেখ?
উঃ- 1946 সালে ক্যবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে গনপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এই নীতিগুলি হল :-
(1) ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী গনপরিষদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গ্রহন করা,
(২) গনপরিষদের সমস্ত আসন সাধারন মুসলিম ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হার অনুযায়ী বিভক্ত করা,

(3) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তর যোগ্য সমানু পাতিক প্রতিনিদ্ধিত্বের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্পদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাবস্তা করা,
(4) লোক সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী গনপরিষদের দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিদ্ধিত্বের ব্যবস্থা করা। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা 389 জন সদস্য স্থির করা হয়। এদের মধ্যে 292 জন সদস্য ব্রিটিশ স্বাসিত প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবার এই 292টি আসনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মুসলমান দের 78 টি শিখদের জন্য 4টি সাধারনের জন্য 210টি আসন নির্দিষ্ট হয়। এছাড়া 93 জন সদস্য দেশীয় রাজ্য থেকে 4জন সদস্য চিপ কমিশনার শাসিত প্রদেশ গুলি থেকে আসবেন বলে স্থির করা হয়, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, 1946 সালে জুলাই মাসে গণপরিষদের গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 292টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস সদস্য বা 208টি আসন লাভ করে। মুসলমান দের জন্য নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে 7 টি ছাড়া বাকি গুলিতে মুসলিম লীগ পার্থীরা জয়ী হন। এছাড়া কংগ্রেস গণপরিষদের 4জন মুসলমান 1জন শিখ প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে বাকি আসন গুলি কমিউনিষ্ট, নির্দল প্রভৃতি গোষ্ঠি দখল করে। গনপরিষদের নির্বাচন কংগ্রেস 69% আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

(7) ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করো?

উঃ- ভারতীয় সংবিধানে প্রনেতারা শুধু স্বাভাবিক অবস্থাতে নয় অ্যাভাবিক অবস্থাতে কী ধরনের সমস্য আসতে পারে এর কীভাবে তা মোকাবিলা করা যাবে, তার প্রমাণ হয়। সংবিধানে অষ্টাদশ অংশে বর্ণিত রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে এক বিবরণে সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে তিন ধরনের জরুরী অবস্থার ঘোষনার ক্ষমতা ন্যাস্ত করা হয়েছে। যথা:-

(1) জাতীয় জরুরী অবস্থা :- সংবিধানে 352 নং ধারা অনুসারে যুদ্ধ অথবা বাইরের আক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীত সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সমগ্র ভারতে তার কোনো অংশে নীরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে অথবা তার ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ছাড়া রাষ্ট্রপতি এরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষনা করতে পারবে না।

(2) রাজ্য শ্বাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষনা : সংবিধানে 356 নং ধারা অনুসারে কোনো রাজ্যের রাজ্য পালের বিবরন থেকে অথবা কোনো বিবরন থেকে রাষ্ট্রপতি যদি সংবিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তখন তিনি শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

(3) আর্থিক জরুরী :- সংবিধানে 360 নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে ভারতে অথবা ভারতের কোনো অংশে আর্থিক স্হায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হয়েছে বা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে তাহলে তিনি আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এর

(8) সুপ্রিমকোর্টের বিচার পতিদের কীভাবে অপসারন করা যায়?

উঃ:-সুপ্রিমকোর্টের বিচার পতিগন 65 বছর বয়স পর্যন্ত বহাল থাকেন। তাঁর আগে রাষ্ট্রপতি প্রমানিত অসামর্থ অসদাচরনের ভিত্তিতে অপসারন করতে পারেন। অপসারন করার পূর্বে পার্লামেন্টের উভয় রাক্ষের মোট সদস্যের উপস্থিত ও ভোটদানকারি সদস্যের 2/3 অংশ সদস্য বিচার পতিদের সানিত প্রস্তাব গৃহীত না হলে রাষ্ট্রপতি কোনো বিচার পতিকে অপসারন করতে পারেন না।

(9.)ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট গুলি লেখো ?

উঃ- পৃথিবীর প্রতিটি দেশে একটি করে সংবিধান থাকতে দেখা যায়। কোথাও লিখিত কোথাত অলিখিত, স্বাধীন ভারতের জনগন 1959 সালে 26শে নভেম্বর সংবিধানটি গ্রহন করা হয় এবং 1950 সালে ২৬শে জানুয়ারী সংবিধানকে কার্যকারি করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট গুলি হল -

(1) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান:- ভারতের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান মূল সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা 395 ধারা ও অন্যান্য উপধারা ও 8 টি তপশিলি ছিল পরবর্তী কালে সংবিধান বহুবার সংশোধিত হয়েছে এবং বেশ কিছু উপধারা এবং তপশিল যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানে মোট 450টি ধারা 12টি তপশিল রয়েছে। ভারতের সংবিধান বৃহত্তম মূল কারন হল বিভিন্ন দেশের সংবিধান কে এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

(২)প্রস্তাবনাঃ- মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনাযুক্ত করা হয়েছে এই প্রস্তাবনা সংবিধানের উৎস, নৈতিক আদর্শ ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মতপ্রকাশ বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা, প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যদা জাতীয় ঐক্য সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে।

(10. শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার সম্পর্কে একটি টীকা লেখ,
উঃ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সত্ব হল শোষন এই

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সূত্র হলো শোষণ'এই শোষণ গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে মূল বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই ভারতীয় সংবিধানে প্রনেতারা সংবিধানের 23ও 24 নং ধারা দুটির মধ্যমে শোষনের বিরুদ্ধে অধিকারকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সংবিধানে 23(1) নং ধারায় মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বেগার খাটানো, বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে শ্রমদানে বাধ্য করানো অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানে ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে 14 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কোনো কারখানায়, খনি, অন্যকোনো বিপদজনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। তবে সংবিধানের নির্দেশ থাকলে যে শোষন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে সে কথা ভাবা উচিত নয়। সংবিধানে তৈরি হওয়ার 69 বছর পরে ও দেশে আজ অসংখ্য ভূমিদাস রয়েছে 5-15 বছর বয়সি শিশু শ্রমিক রয়েছে 1 কোটি 60লক্ষ।

(11.) শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে একটি (টীকা লেখো),

উঃ:-2002 সালে প্রণীত 86তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায়ে 21 (ক) নং ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই ধারায় বলা হয়েছে, 6-14 বছর বয়স ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতা মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করবে I রাষ্ট্র এর পর 2010 সালে পার্লামেন্ট শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়ন করে এবং ওই বছর এপ্রিল মাস থেকে আইনটি কার্যকর করার জন্য কৈন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেয়, যখন এই শিক্ষার অধিকারটি কথা বলা হয় তখনই এই অধিকারটি কার্যকর করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে নিয়ে একটি আলাদা শিক্ষা বিল প্রণয়নের কথা বলা হয়। সেই অনুযায়ী 2005 সালে এই সংক্রান্ত বিলে একটি খড়সা প্রণয়ন করা হয়। এই খসার্টি প্রচন্ড বিরোধীতার সম্মুখিন হয়। এই খসড়ায় অনগ্রসর শ্রেণীর ছেলে - মেয়েদের জন্য বেসরকারি স্কুলগুলিতে 25 শতাং আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয় এই সংরক্ষনটি রাখার উদ্দেশ্য ছিল এই অধিকারটি একটি গণতান্ত্রিক সাম্য ভিত্তিক সমাজে উপযুক্ত করে তোলা, যাইহোক শোষন পর্যন্ত 2009সালে সেপ্টম্বরে বিলটি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হলে তা আইনে পরিনত হয়।

(12) জনস্বার্থবাহী মামলা বলতে তুমি কী বোঝ?

উঃ মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানে 32 এবং 226 নং ধারা দুটি খুব গুরত্ব পূর্ণ কিন্তু এই ধারাগুলির আশ্রয় নিয়ে বিচার পাওয়া একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই ৪০ এর দশক থেকে শুরু করে সুপ্রিমকোর্ট এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। 1981সালে ডিসেম্বর মাসে সুপ্রিমকোর্ট এক যুগান্তকারী রায় দেয়। বলা হয়, ব্যক্তিগত দাবি ও অধিকার প্রয়োগ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য যেকেউ মামলা দায়ের করতে পারে। এছাড়া কম খরচে পিটিশনের মাধ্যমে মামলার দায়ের করার বিধিব্যবস্থা শিথিলকরা হয়। এবং মাননীয় বিচার পতিদের কাছে শুধুমাত্র একটি চিঠির মাধ্যমে তথ্য দিলেও কোর্ট সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে পারবে। যদি অভিযোগ গ্রহন যোগ্য হয়। এইভাবে। 1985 সালে সেই সময়কার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচার পতি পি.এন. ভগবতীর কাছে এক ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে অভিযোগ জানায়, বিচারপতি ভগবতী সেই চিঠিক আবেদন পত্র হিসাবে গ্রহণ করে এই ধরনের মামলার জনস্বার্থবাহী মামলা আক্ষা দেওয়া হয় (PIL)

জনস্বার্থবাহী মামলায়, কোনো ব্যক্তির স্বার্থ, জনগনের পি.এন. স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয় গুলি আদালতে গ্রাহ্য ভগবতীর মতে জনস্বার্থবাহী মামলা হল আইন গত সাহায্য বিষয়ক আন্দোলনের একটি কৌশল গত হাতিয়ার। এর আসল উদ্দেশ্য হল সমাজের পিছিয়ে পড়া, দুর্বল শোষিত মানুষের কাছে ন্যায় বিচার, সরকারের কোনো ভুল সিদ্ধান্তের কারণে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হলে ও তাও জনস্বার্থবাহী মামলা আওতায় পড়ে।

(13) বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে তুমি কী বোঝ?

উঃ- গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সংবিধানের ব্যাখ্যা - কর্তা ও অভিভাবক হিসাবে বিচার বিভাগের ভূমিকা রয়েছে I এছাড়া দেশে সংবিধানিক ব্যবস্থা এবং আইন কানুনের মৌলিক কাঠামো সংরক্ষণের দ্বায়িত্ব বিচার বিভাগের হাতে রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃ বৃন্দের দ্বারা পরিচালিত আইন ও শাসন বিভাগ যখন তাদের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটায় দেশের সংবিধানিক ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে তখন বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার উদ্ভব ঘটে (Judical activism)

বিচার বিভাগীয়, সক্রিয়তা, বলতে বিচার বিভাগে সক্রিয় পদক্ষেপে গ্রহণ করাকে বোঝায়। বিচারপতি সাওন্ত "Judicial trend and Prospects" গ্রন্থএঅভিমত প্রকাশ করেন যে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে সেই কাজকে

বোঝায় যা আইন বিভাগ শাসন বিভাগের উপর প্রাধান্য বিস্তার কে সুচিত করে ভারতীয় বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে সংবিধানের এক্তিয়ার বাইরে গিয়ে হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট আইন বিভাগ বা শাসন বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করাকে বোঝায়, ভারমারের মতে সাধারণ বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা বলতে সাধারন মানুষের কাছে ন্যায়বিচারের দরজা খুলে দেওয়া এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণকে বোঝায়, সুপ্রিমকোর্ট প্রচলিত এক্তিয়ারের বাইরে জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় বিষয়ে ঐতিহাসিক রায় দানের পরিপেক্ষিতে তার ভূমিকাকে বাড়িয়েছে অধ্যাপক জোহারীর মতে 1980 সালের পর থেকে বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তার উদ্ভব ঘটে।

(14.) রাজ্যসভা কীভাবে গঠিত হয়।

উঃ- সংবিধানে ৪০ নং ধারা অনুযায়ী অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হয়। এর মধ্যে 12 জন সদস্য রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা সমাজসেবা ইত্যাদী ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি 12জন সদস্যকে মনোনয়ন করেন। সাধারণত প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই মনোনয়ন বারে। থাকেন অবশিষ্ট সদস্যরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র শ্বাসিত অঞ্চল গুলি থেকে পরক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধানে 80 (4) নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত প্রতিনিধীরা একক হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিদ্ধিত্বের ভিত্তিতে রাজ্য সভার প্রতিনিধি দের নির্বাচন করান। আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রতিনিধি গণ এই উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাচক সংস্থার দ্বারা একক হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিদ্ধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। বর্তমানে রাজ্য সভার মোট সদস্য সংখ্যা হল 245 জন।
(1)রাজ্য সভার সদস্য হতে গেলে পার্থিকে ভারতীয় নাগরীক হতে হবে।
(2)কমপক্ষে 30 বছর বয়সী হতে হবে!
(3)পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে যে সব যোগ্যতা নির্ধারন করবে পার্থিকে সে সবের অধিকারী হতে হবে।
(4) সরকারি লাভ জনক পদে থাকলে চলবে না।
(৫) বিকৃত মস্তিষ্ক এবং দেউলিয়া বলে ঘোষিত ব্যক্তি পার্থি হতে পারবে না। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী রাক্ষ, রাজ্য সভার সদস্যরা 6 বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং বাকি ২ বছর অন্তর 1/3 অংশ সদস্য অবসর নেন এবং সমান সংখ্যক সদস্য তার জায়গায় নির্বাচিত হন। পদাধিকার বলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্য সভার সভাপতি। তার অনুপস্থিতে সভার কাজ পরিচালনার জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সহসভাপতি পদে নির্বাচিত করেন।
(15) লোকসভার গঠন সম্পর্কে লেখ?

উঃ ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়, সেই কারনে লোকসভাকে জনপ্রতিনিধি কক্ষ রুপে অভিহিত করা হয়। লোক সভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বর্তমানে 552 মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে 530 জন অঙ্গরাজ্য গুলিথেকে এবং অনধিক ২০ জন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলি থেকে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 5 বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এছাড়া ঈঙ্গভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি 2জন সদস্য লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন তবে তা বর্তমানে 545 জন লোকসভার সদস্য রয়েছে এদের মধ্যে 530 জন অরাজ্য গুলি থেকে এবং 13 জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন এবং ২জন ঈঙ্গভারতীয় রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হন। সংবিধানে 84নং ধারায় বলা হয়েছে লোক সভার সদস্য হতে গেলে পার্থীকে ভারতীয় নাগরীক হতে হবে, ও 25 বছর বয়সী হতে হবে, পার্লামেন্ট দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতার অধিকারীহতে হবে, সরকারি কোনো লাভজনক পদে থাকলে হবে না বিকৃত মস্তিষ্ক ও দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে হবে না।

লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ 5 বছর রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। লোক সভা প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার এবং একজনকে ডেপুটি স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত করেন।

(16) মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নীর্দেশ মূলক নীতির পার্থক্য গুলি আলোচনা করো?

উঃ- নীর্দেশ মূলক নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট গুলিকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে হলে মৌলিক অধিকার গুলির সঙ্গে নির্দেশ মূলক নীতির পার্থক্য জানা প্রয়োজন ভারতীয় সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার সমূহ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে নীদেশ সমূহ নীতি গুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই দুয়ের মধ্যে কতগুলি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে।

(1) মৌলিক অধিকার গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য কিন্তু নির্দেশ সমূহ নীতি গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয়, নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল - আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রতি সাধারণ নির্দেশ মাত্র। এই নির্দেশ গুলি পালন না করলেও শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় না।

(2) মৌলিক অধিকার গুলি কার্যকর করার জন্য কোন পৃথক বাতাদার আলাদা আইনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য পৃথক আইনের প্রয়োজন হয়।

(3) মৌলিক অধিকার সমূহের লক্ষ হল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন, অপর দিকে, নীর্দেশ মূলক নীতিগুলির, উদ্দেশ্য হল জনকল্যান কর সমাজ গঠন করা। এক্ষেত্রে বলা যায় মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি হল রাজনৈতিক অপরদিকে নীদেশ মূলক নীতিগুলির প্রকৃতি হল, সমাজিক অর্থনৈতিক।

(4) মৌলিক অধিকার গুলি সরকারের কার্যকলাপের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করে তা এগুলি নীতি বাচক। অপর দিকে মীর্দেশ মূলক নীতি গুলি রাষ্ট্র কী কী কাজ করবে। কোন কোন আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে নীর্দেশ দেয়, তাই এগুলি ইতিবাচক।

(5)মৌলিক অধিকার গুলি মূলত স্থিতিশীল, কারন সংবিধানে তৈরি হওয়ার পর মৌলিক অধিকারের মৌলিক অধ্যায়ে কোনো সংযোজন হয়নি, বরং বিয়োজন ঘটছে। কিন্তু নীর্দেশমূলক নীতিগুলি গতিশীল জনগণের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে এই নীতিগুলি পরিবর্তন বা সংযোজন দুইই হতে পারে।

1). ভারতের সুপ্রিমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পকে আলোচনা কর?

উঃ- ভারতের বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে রয়েছে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট। এই বিচার ব্যবস্থা হল ভারতের কেন্দ্রী ভূত ও অখন্ড বিচার ব্যবস্থা। এই আদালত কে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলা হয়। মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল একজন প্রধান বিচার প্রতি এবং অনধিক সাতজন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হবে। তবে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচার পতির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন। (128 নং ধারা) 1956, 1960, 1973 এবং 1986 সালে আইন প্রণয়ন করে পার্লামেন্ট অন্যান্য বিচার পতির সংখ্যা যথাক্রমে 10, 13, 17 এবং 25 জন করে। য়। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, বিচার পতি নিয়োগের পূর্বে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কর্মরত, বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। এই পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতা মূলক নয়। অবশ্য প্রধান বিচার পতি ছাড়া অন্যান্য বিচার পতি নিয়োগের আগে ভারতের প্রধান বিচার পতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেকটা তত্বগত। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই নিযুক্তির কাজ সম্পন্ন করেন। ভারতের সুপ্রিমকোর্টের বিচার পতিদের যোগ্যতা ব্যাপারে বলা হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী তাঁকে –
(1) ভারতের নাগরিক হতে হবে.
(2) কমপক্ষে কোনো হাইকোর্টের বিচার প্রতিহিসাবে পাঁচ/5 বছর কাজকরতে হবে ।
(3) কোনো হাইকোর্টে অত্যন্ত দশ/ 10 বছর অ্যাডভোকেট হিসাবে থাকতে হবে। অথবা রাষ্ট্রপতির মতানুসারে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগন 65 বছর পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কার্যকালের শেষ হওয়ার আগে কোনো বিচারপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। আবার রাষ্ট্রপতি কোনো বিচারপতিকে প্রমাণিত অসামর্থ্য বা অসদাচরনের জন্য পদচ্যুতি করতে পারেন। তবে এর জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের উপস্থিত এবং ভোটদান কারী সদস্যদের 2/3 অংশের দ্বারা সমর্থিত প্রস্তাব থাকা প্রয়ো জন। অবসর গ্রহণের পর সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতি ভারতের কোনো বিচারালয়ে আইন জীবি হিসাবে কাজ করতে পারেন না।

2009 সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের প্রধানবিচার পতি এবং অন্যান্য বিচারপতি বর্তমানে যথাক্রেমে মাসিক 100000 এবং 90000টাকা ভাতা পান বর্তমানে তাঁদের বেতন কাঠামোর অনেকক্ষানি পরিবর্তন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ভাতা বিনা ভাড়ায় সরকারী বাসভবন প্রভৃতির সুযোগ ও তারা পায়।

(i) ক্ষমতাও কার্যাবলী : ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, সুপ্রিম কোটকে একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে মৌলিক অধিকারের রক্ষা বার্তা হিসাবে: সর্বচ্চো আপিল আদালত হিসাবে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ দাতা হিসাবে কার্য সম্পাদন করতে হয়। ভারতীয় সংবিধানে131-145 নং ধারাগুলিতে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টকে অনেক গুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানে 131 নং ধারা অনুযায়ী যে সব বিষয়ের মামলা হাই কোর্ট বা অন্য কোনো অধস্তন আদালতে দায়ের করা যায় না, সেই বিষয় গুলি সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার অন্তরভুক্ত, আইনগত অধিকারের প্রশ্নে —
(1) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ বাঁধলো।
(২) কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বা একটি রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখাদিলে।
(3) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিলে একমাত্র সুপ্রিমকোর্ট তার নিষ্পত্তি করার অধিকারী। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার অন্তরভুক্ত। প্রস্তুত উল্লেখ্য সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগে যে সব সন্ধি, চুক্তি অঙ্গীকার পত্র, সনদ সম্পাদিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত যে গুলি কে কেন্দ্র করে কোনো বিরোধ বাঁধলে সুপ্রিমকোর্ট তার নিষ্পত্তি করতে পারে না। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে কিংবা একটি রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য একটি রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ বাঁধলো সেই বিরোধের বিচার সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার মধ্যে পড়ে না।

সংবিধান অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট হল দেশের সর্বচো আপিন আদালত। এই আপিল চার ধরনের হতে পারে যথা:-
(1) দেওয়ানী আপীল ,
(2)ফৌজদারী আপিল।
(৩) সংবিধান সংক্রান্ত আপীল,
(4) বিশেষ অনুমতি সূত্রে আপীল ।

দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্ট |আপিল করাযায়। যদি হাইকোর্ট এই মর্মে প্রমাণ পত্র দেয় যে:-
(i) মামলাটির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আইন গত প্রশ্ন জড়িত আছে এবং
(ii) মামলাটি সুপ্রিমকোর্টে আপিল যোগ।

*ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে - (i) নিম্নতম আদালতে নির্দেশ প্রমানিত হওয়ার পর আসামীকে হাইকোর্টে মৃত্যুদন্ত দেওয়া হল I সুপ্রিম কোর্ট সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যায়,
, (ii) নিম্নতম আদালতে বিচার চলাকালীন কোনো মামলা হাইকোর্ট নিজের হাতে তুলে নিয়ে অভিযুক্ত কে প্রানদন্ডের আদেশ দিলে,
(iii) হাইকোর্ট নিজেও এক্ষেত্রে আপিলের অনুমতি দিতে পারে। দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য যে কোনো প্রকার মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মর্মে প্রমান পত্র দেয় যে মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে সেক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট আপীল করা যায়। কখনো কখনো হাইকোর্টের অনুমতি ছাড়াই যে কোনো বিষয়ে আপীলের আবেদন গ্রহণ করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের আছে। একে বলা হয় বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপীলাত।

(2) পরামর্শদান এলাকা : সংবিধানে 143(1) নং ধারায় বলা হয়েছে আইনের তথ্য সম্পর্কিত কোনো সার্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ চাইলে সুপ্রিমকোর্ট সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারে। পরামর্শ, দানের এই ক্ষমতা বলে 1957 সালে কেরলে শিক্ষাবিল, 1959 সালে বেরুবাড়ি হস্তান্তর, 1982 সালে জম্মুকাশ্মির পুনর্বাসন বিল হিত্যাদী। নানা প্রেশ্নে সুপ্রিমকোর্ট রাষ্ট্র পতিকে পরামর্শ দিয়েছে। সুপ্রিমকোর্ট অবশ্য সবক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে বাধ্য নয় এবং রাষ্ট্রপতি ও সেই পরামর্শ গ্রহন করতে বাধ্য থাকেন না। তবে সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে সকল সন্ধিচুক্তি, অভিকার পত্র, সনদ সম্পাদিত হয়েছে, এবং সংবিধান চালু হওয়ার পরও কার্যকর হয়েছে, সেই সকল বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের মতামত চাইলে সুপ্রিম কোর্ট তার মতামত জানতে বাধ্য।
(3) মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা বা নির্দেশ রা আদেশ বা লেখ জারি এলাকা:--
নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অভি ভাবক ও রক্ষক রূপে সুপ্রিমকোর্ট একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো নাগরিকের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তিনি সুপ্রিমকোর্টর কাছে আবেদন করতে পারেন,

এবং সুপ্রিমকোর্ট তার মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে বন্দি প্রতক্ষীকরণ, পরমা আদেশ প্রতিশোধ, অধিকার ইচ্ছা এবং উৎপ্রেষন প্রভৃতি ধরনের নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ জাবি করতে পারে, তবে দেশের জাতীয় জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকলে রাষ্ট্রপতির আদেশ প্রদান করে সুপ্রিমকোর্ট এই লেখ জারী করার ক্ষমতা অকার্যকর করে দিতে পারে।

উপরিউক্ত ক্ষমতাগুলি ছাড়া সুপ্রিমকোর্টের আরো কত গুলি গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যথা:-

(1) সংবিধানে 129 নং ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট অভিলেখ আদালত হিসাবে কাজ করেন।

(2) সুপ্রিমকোর্ট নিজের অবমাননার জন্য অবমাননা কারীকে শাস্তি দিতে পারে।

(3) সুপ্রিমকোর্ট নিজের দেওয়া রায় বা সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা করতে পারে।

(4) সারাদেশের বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রের ভার সুপ্রিমকোর্টের নিজস্ব কম। ও এবং আধিকারিক নিয়োগে পূর্ণ স্বাধীনতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে।

,মূল্যায়ন :- যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সর্বোচ্ছ আপীল আদালত হিসাবেও মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসাবে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী বিচারালয় বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্ট কে বোঝায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকদের রায়ই সংবিধান অনেকের মতে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের থেকেও বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন। তাদের মতে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের মতো মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের আপীল এলাকা তাছাড়া মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের - পরামর্শ দান এলাকা বলতে কিছু নেই শুধুমাত্র মূল এলাকাটুকু বাদ দিয়ে অন্য সবব্যাপারি ভারতের সুপ্রিমকোর্ট মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী।

কিন্তু ভারতের সুপ্রিমকোর্ট সম্পর্কে এধরনের মন্তব্যর বিষয়ে অনেকেই সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন। এঁদের মতে একটি দেশের বিচার বিভাগ কতখানি শক্তিশালীতা নির্ভর করে সেই দেশের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার ব্যাপকতার উপর, মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে বিচার কার্য সম্পাদন করার অধিকারী বলে মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট কোনো আইনের পদ্ধতিগত দিক ছাড়াও উৎকর্ষের দিকটি ও বিচার করতে পারে, ভারতের সুপ্রিমকোর্টকে কোনো আইনের যৌতিকতা বা ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

(2)ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে সংবিধানিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো?

উঃ- ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্ট দ্বীকক্ষ বিশিষ্ট। এই দুটি কক্ষের মধ্যে নিম্ন কক্ষ হলো লোক সভাও উচ্চবাও হল রাজ্যসভা। লোকসভা ও রাজ্য সভার মধ্যে গঠনগত দিক থেকে কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রাজ্য সভা সংখ্যা অনধিকা 250 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে যেখানে লোকসভার সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক 552 হতে পারে। সংবিধানে 80 নং ধারা অনুসারে অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হয়। এর মধ্যে 12 জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনিত হন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা ইত্যাদী ক্ষেত্রে কৃতি ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই মনোনয়ন করে থাকেন। অবশিষ্ট সদস্যরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলি থেকে নির্বাচিত হন।

লোক সভায় নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বর্তমানে অনধিক 550 এর মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। ,84তম সংবিধান সংশোধনি অনুসারে এই সংখ্যা 2026 সাল. পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে অঙ্গ রাজ্যগুলির 530 জন, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলির ওজন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনিত দুই / ২ জন ইঙ্গ ভারতীয় সদস্য নিয়ে সর্বমোট 545রয়েছেন। কার্যকালের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজ্য সভার স্থায়ীকক্ষ এবং রাজ্য সভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ছয় বছর। প্রতি দুই বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেন। কিন্তু লোক সভা স্থায়ী কক্ষনয়। লোক সভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ 5 বছর। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে প্রধান মন্ত্রির সুপারিশ ক্রমে রাষ্ট্রপতি লোক সভা ভেঙে দিতে পারেন।

পদাধিকার বলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্য সভার সভাপতি, তিনি রাজ্যসভার অধিবেশন গুলিতে সভাপতিত্ব করেন। রাজ্য সভার উপসভাপতি সভার সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করে থাকেন। লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন কে অধ্যক্ষ এবং একজনকে উপাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করেন। লোকসভা ও রাজ্য সভার মধ্যে যে সাংবিধানিক সম্পর্ক রয়েছে তা মূলত তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায় যথা-

(1) যেক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোক সভা উভয়ে সমান ক্ষয়তার অধিকারী।

(২) যেক্ষেত্রে লোকসভা রাজ্যসভার চেয়ে রেশি ক্ষমতার অধিকারী।

(ক) রাজ্যসভাও লোকসভাসমক্ষমতা সম্পন্ন :--: রাজ্যসভাও লোক সভা বেশ কিছু ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতার অধিকারী যথা:-
(1) পার্লামেন্টে বিল পাশের ক্ষমতার ক্ষেত্রে একমাত্র অর্থবিল ছাড়া রাজ্যসভা ও লোকসভা অন্যান্য বিলের ব্যাপারে সমান ক্ষমতার অধিকারী।
(ii) সংবিধানে সংশোধনের ক্ষেত্রেও দুটি কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যায়না।
(iii) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও পদচ্যুতির বিষয়ে এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতার অধিকারী এছাড়া সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্ট বিচার পতিদের অপসারন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিরন্ত্রক ও মহাগননা পরিক্ষক প্রমুখ পদাধিকারীদের অপসারনের ক্ষেত্রে রাজ্য সভা ও লোকসভা অমান ক্ষমতা রয়েছে।

(iv) আইন সভায় অবমাননা বা অধিকার ভঙের অভিযোগে সংসদের কোনো সদস্য বা সদস্য নয় এমন ব্যক্তিকে উভয় কক্ষের শাস্তিদেওয়ার ক্ষমতা আছে,
(৫) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হাইকোর্ট স্থাপন এবং কেন্দ্র শাষিত অঞ্চলে হাইকোর্টের ক্ষমতার পরিধির বৃদ্ধি করার বিষয়ে দুটি কক্ষে সমান ক্ষমতার অধিকারী।
(vi) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষীত জরুরী অবস্থা অনুমোদনের ব্যাপারে লোকসভা ও রাজ্য সভার সমান ক্ষমতা রয়েছে।

(খ) রাজ্যসভার প্রাধান্য :- আইন সভার স্থায়ী কক্ষ হিসেবে রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ভোগ করে। যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সভা লোক সভার তুলনায় বেশি ক্ষমতা ভোগ করে সেগুলি হল –

(1) রাজ্যসভার উপস্থিত ও ভোটদান কারী সদস্যদের 2/3 অংশ যদি এমন প্রস্তাব গ্রহন করেন যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকার কোনো বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তাহলে পার্লামেন্ট সে বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে।
(2) রাজ্যসভার উপস্থিত ও ভোট দানকারী সদস্যদের 2/3 অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেন্ট এলাকা এক বা একাধিক সর্বভারতীয় চাকরির সৃষ্টির জন্য আইন প্রনয়ন করতে পারে (312 নং ধারা)
(3) উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি সংক্রান্ত প্রস্তাব শুধুমাত্র রাজ্য সভায় উত্তাপন করা হয়,

(গ) লোকসভার প্রাধান্যঃ —যেসব ক্ষেত্রে লোকসভা ক্ষমতার প্রাধান্য রয়েছে সেসব বিষয় গুলি হল –
(1) অর্থবিলের ব্যাপারে জাতীয় ক্ষমতা একমাত্র লোক সভার রয়েছে। অর্থবিল একমাত্র লোকসভাতেই উত্তাপিত হতে পারে। তাছাড়া কোনো বিল অর্থবিল কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ দেখাদিলে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কোনো অর্থবিল প্রত্যাখান বা সংশোধন করার ক্ষমতা রাজ্য সভার নেই। রাজ্য সভাকে অর্থবিল সম্বন্ধে 14 দিনের মধ্যে মতামত জানাতে হয়।
(2) কোনো সাধারণ বিল নিয়ে লোকসভা ও রাজ্য সভার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংশার জন্য রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের এক যৌথ অধিবেশন ডাকতে পারেন। লোকসভার অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে সেই অধিবেশনের সংখ্যাগরিষ্ঠে বিলটি ভাগ্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে লোকসভায় মতামতই জয়ী হয় কারন লোকসভার আয়তন রাজ্য সভার মীরিক্ষে দ্বিগুনেরও বেশি।
(3) 44 তম সংবিধানে সংশোধনী অনুযায়ী জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের ব্যাপারে লোকসভা কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য।

,(4) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা তার কাজ কর্মের জন্য শুধুমাত্র লোক সভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে আনার ক্ষমতা একমাত্র লোক সভারই রয়েছে। এই কারণে লোক সভার আস্থা হারালে মন্ত্রী ত সভার পতন ঘটে।

মূল্যায়ন ::--: ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষের মধ্যে শাসন তান্ত্রিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের শেষে বলা যায় যে, কিছু ক্ষেত্রে সমমর্যাদা সম্পন্ন হলেও সামগ্রিক দিক থেকে লোকসভা রাজ্য সভার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কক্ষ হিসাবে লোক সভার গুরুত্ব সভাবতই বেশি। গণতান্ত্রিক কাঠামোর এরকম হওয়াই স্বাভাবিক ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রিতি নীতির

ভিত্তিতেই দুটি কক্ষের মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন। তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লোকসভার মত ভারতীয় পার্লামেন্টের উষ্চকক্ষ রাজ্য সভা একেবারে ক্ষমতা হীন নয়। অন্যদিকে মার্কিন আইন সভার উষ্চকক্ষ সিনেটের মতো রাজ্যসভা শক্তিশালী ও নয়।

(3)ভারতীয় সংবিধানে 19-22 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে লেখো?

উঃ– যুগে যুগে যে রাজনৈতিক আদর্শ মানুষকে সংগ্রামে প্রেরনা দিয়েছিল এবং নতুন সমাজ গঠনে উৎসাহ দান করেছিল স্বাধীনতা তাদের অন্যতম। এই জনপ্রিয় রাজনৈতিক আদর্শ ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম মূল মন্ত্র ছিল। স্বাধীনতা হল প্রচলিত সকল বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে দামি। এই স্বাধীনতা কে রক্ষা করার জন্য তাই মানুষ সর্বত্র সংগ্রাম করেছে। কারন স্বাধীনতা এমন পরিবেশ প্রদান করতে পারে যেখানে ব্যক্তিতা ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে সক্ষম হয়।

ভারতীয় সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায়ে ২২নং ধারায় মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার ঘোষনা করা হয়েছে, এবং 6প্রাকার স্বাধীনতা অধিকার মানুষ ভোগ করতে পারবে।, 1978
সালে সংবিধানে 44 তম সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার কে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানে 19 (1) (ক) নং ধারায় বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার স্বকৃতি লাভ করেছে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে প্রয়োজনীয় শর্ত হল এই অধিকার। এর ফলে নাগরীকরা নিজস্ব বিবেক, বুদ্ধি, মতাদর্শ ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী লিখিত বা মৌখিক ভাবে, পত্রপত্রিকা, পুস্তক পুস্তিকা, সংবাদ পত্র, সভাসমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে।

মুদ্রন যন্ত্রের স্বাধীনতাকে এই স্বাধীনতার মধ্যে অন্তরভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্র যেসব কারণে নিয়ন্ত্রন করতে পারে।
(1) ভারতের সার্বভৌমত্ব সংহতি রক্ষা।
(2) রাষ্ট্রিয়াতে নীরাপত্তা রক্ষা।
(3) বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা।
(4) দেশের শান্তীশৃঙ্খলা রক্ষা।
(5) আদালত অবমাননাপ্রতিরোধ।
(6) মানহানী প্রতিরোধ।
(7) অপরাধ মূলক কাজে উৎসাহ বন্ধ করা ইত্যাদী।

19 (1) (খ) নং ধারায় ভারতীয় নাগরীকদের শান্তী পূর্ণ ও নিরস্ত ভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এ এই অধিকার কিছু বাধা নিষেধ হয়েছে যেমন— (1) সভা সমাবেশ শান্তীপূর্ণ হবে।
2.নিরস্তভাবে সমবেত হতে হবে।
(3) জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার কারনে এই অধিকারে উপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা যায়।

19 (1) (গ) নং ধারায় অনুযায়ী ভারতের নাগরিকরা যে কোনো সংঘ সমিতি স্বাধীনভাবে গঠন করতে পারে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, বিজ্ঞান ইত্যাদী ক্ষেত্র সংঘ গঠন করা ছাড়াও রাজনৈতিক দল শ্রমিক সংঘ এই অধিকারের অন্তরভুক্ত। কিন্তু এই অধিকারের উপর কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যেমন :-
(1) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারী ইত্যাদী ক্ষেত্রে।

(19) (1) (ঘ) নং ধারায় ভারতে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা অধিকার নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জনস্বার্থে তপশিলী জাতী ও উপজাতীদের স্বার্থ সংরক্ষনের উদ্দেশে এই অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে,

19 (1) (ঙ) নং ধারায় ভারতের যে কোনো স্থানে বসবাস করার অধিকার নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে। তবে জনস্বার্থে ও তপশিলি উপজাতীদের উদ্দেস্য স্বার্থসংরক্ষণে উদ্দেশ্য এই অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

19 (1) (চ) নং ধারায় যে কোনো বৃত্তি ও পেশা ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার প্রতিটি নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ,এই অধিকার রাষ্ট্র জনস্বার্থের কারনে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া কোনো বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্র যোগ্যতা স্থির করে দিতে পারে যেমন ডাক্তারি ডিগ্রি না থাকলে চিকিৎসা করার অধিকার থাকে না। সুতরাং স্বাধীনতার অধিকার অবাধ নয় অর্থাৎ, কিছু বিধি নিষেধ মেনে এই অধিকার ভোগ করতে হয়। জাতীয় জরুরী অবস্থার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি এই স্বাধীনতার অধিকার গুলি স্থগিত রাখতে পারে।

20 (1) নং ধায় বলা হয়েছে এবং দেশের প্রচলিত আইন অমান্য করার অপরাধ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে।

20 (2) নং ধারায় বলা হয়েছে, একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত বা দণ্ডিত করা যাবে না।

20(3) নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি কে আদালত তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

২১নং ধারায় বলা হয়েছে আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। 1978 সালে 44তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী এই অধিকারটি বিশেষ মর্যদা পেয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি এই অধিকারই স্বগীত করতে পারেনা এছাড়া 2002 সালে 86 তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী 21. (ক) নামে নতুন একটি ধারা সংযোজীত করে শিক্ষার অধিকার কে মৌলিক অধিকারের মর্যাদাদান করা হয়েছে। 6-14 বছর বয়সী বালক বালিকা দের জন্য রাষ্ট্র অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করবে।

সংবিধানের ২২ নং ধারায় গ্রেপ্তার সংক্রান্ত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে অচকোর আইন জানাতে হবে।

22 (1) আটক ব্যক্তিকে তার উকিলের মাধ্যমে আত্মকক্ষ সমর্থনের অধিকার দিতে হবে।

২২ (২) নং ধারা। আটক করার 24 ঘন্টা মধ্যে সেই ব্যক্তিটিকে কাছাকাছি জেলাশাসকের কাছে হাজির করতে হবে। জেলাশাসকের অনুমতি ছাড়া বেশি সময় ধরে আটকে রাখা যাবে না।

22 (3) নং ধারা কিন্তু বর্তমান দিনে নীবর্তন মূলক আটক আইনে অপপ্রয়োগ ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক খানি ক্ষুন্ন করেছে যা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী।

(4) রাষ্ট্র পরিচালনা নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রকৃতি ,বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য আলোচনা কর?

উঃ- গণতন্ত্রকে প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গনতন্ত যথেষ্ট নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার, এই কারণে ভারতীয় সংবিধানের প্রনেতাগন কতগুলি মৌলিক অধিকার ঘোষনা করে শান্ত থাকেনি গণতন্ত্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রসারিত করার উদ্দেশ্য সংবিধানের চতুর্থ অধ্যারে 36 থেকে 51 নং ধারা গুলিতে কতকগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতির উল্লেখ করেন। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রুপকার ড. বি আর আম্বেদকর মন্তব্য করেন আমরা শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হবোনা, আমরা চাই অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতির ধারণা টি মূলত আয়াল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরণে গ্রহণ করা হয়েছে, সংবিধানে 37নং অনুচ্ছেদে বলাহয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয়। ঠিকই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলি মৌলিক রূপে গণ্য হয় এবং আইন প্রণয়নের সময় এগুলিকে প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য স্যার আইফর গেনিংসের মতে, জওহরলাল নেহেরু, আম্বেদকর প্রমুখের দ্বারা অনুসৃত গণতান্ত্রিক সমাজ তন্ত্রের আদর্শটি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতিগুলির উৎস হিসাবে কাজ করেছে। অধ্যাপক জে.সি. জোহারি প্রায় একই সুরে বলেন যে নির্দেশ মূলক নীতিগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে গান্ধিবাদী আদর্শের স্পর্শ যুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দর্শন, নির্দেশ মূলক নীতি গুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য গুলি যথার্থ- ভাবে উপলব্ধিকরতে হলে, মৌলিক অধিকারের নির্দেশ মূলক নীতি গুলির পার্থক্য থাকাপ্রয়োজন যথা-

(1) মৌলিক অধিকার গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতি আদালতকর্তৃক বলবৎ নয়। নির্দেশ মূলক নীতি গুলি আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রতি সাধারন নির্দেশ মাত্র। এই নির্দেশ গুলি কার্যকর না হলেও আইন প্রনেতা বা শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় না।
(২) মৌলিক অধিকারগুলি সরকারের কার্যকলাপের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করে। তাই এগুলি নেতিবাচক অপর পক্ষে নির্দেশ মূলক নীতিগুলি রাষ্ট্র কী কী কার্য করবে,কোন কোন আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। তাই এগুলি ইতিবাচক।
(3) মৌলিক অধিকার ও নির্দেশ মূলক নীতির মধ্যে বিরোধ বাঁধলে, মৌলিক অধিকার কে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নির্দেশ মূলক নীতি কি বাতিল হয়ে যায়, তবে 1973 সালে প্রণিত বৃহত্তর সংবিধান সংশোধনী আইনে নির্দেশ মূলক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকার গুলির উপর স্থান দেওয়া হয়েছে।
(4) মৌলিক অধিকার গুলিকে বলবত বা কার্যকর করার জন্য কোনো পৃথক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়না, কিন্তু নির্দেশ মূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়,

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশ মূলক নীতিগুলির মধ্যে আইনগত পার্থক্য যাই হোকনা কেন এদের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই, বরং একে অপরের পরিপুরক। উভয়রেই উদ্দেশ্য হল এমন একটি জনকল্যান কর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারা যেখানে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা থাকবে। মির্নাভামিলস বনাম ভারত সরকার মামলায় (1980) খ্রি: সুপ্রিম কোর্ট অনুরুপ মন্তব্য করে বলেছে মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশ মূলক নীতি সমূহ সংবিধানের বিবেক, স্বরুপ। নির্দেশ মূলক নীতি গুলিকায়েকাটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলে। আর মৌলিক অধিকারগুলি সেই লক্ষ্যে পৌছাবার উপায় নির্দেশ করে।

*রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতি সমূহঃ — ভারতীয় সংবিধানে 36 থেকে 51 নং ধারা গুলিতে যে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতি গুলি বর্ণনা করা হয়েছে সে গুলি হল:--

(1) সমাজিক ও অর্থনৈতিক,
(2) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক।
(3) আইন ও প্রশাসন বিষয় .
(4) আন্তরর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক।

এই চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
(1) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক নীতি সমূহঃ⇒এই জাতীয় নীতি গুলির মধ্যে অন্যতম হল :-

(i) জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে যে খানে সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। 38 (1) এবং যেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে অনুরুপ বৈষম্য থাকবেনা 38 (2)।

(ii) রাষ্ট্র এমন ভাবে তার নীতি গুলিকে পরিচালনা করবে যাতে -

(ক) স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক পর্যাপ্ত জীবিকা অজর্নের সুযোগ পায়।
(খ) দেশের সম্পদ এমনভাবে বণ্টিত হবে যেন সর্ব সাধারনের মঙ্গল হয়,
(গ) উৎপাদনের উপায় গুলি যে মুষ্টিমেয় এর হাতে কেন্দ্রিভূত না হয়।
(ঘ) একই কাজের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ একই মজুরি পায়।
(ঙ) স্ত্রী পুরুষের নির্বিশেষে প্রতিটি শ্রমিকের স্বাস্থ কর্মশক্তি এবং শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না হয়।
(চ) শিমুর স্বাক্ষ্য সম্মত মর্যদা পূর্ণ ও স্বাধিন পরিবেশে বড়ো হয় এবং তাদের মেয়র ও যৌবন শোষণ মুক্ত হয়। (39) নং ধারা)

(৩) ন্যায় বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন বলবত হবে। এবং দরীদ্র ব্যক্তিদের জন্য বিনা খরচে আইনের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করবে (39নং ধারা)
(iv) বেকার, বাধ্যব্য এবং অসুস্থ অবস্থায় নাগরিক নন সরকারী সাহায্য লাভ করবে। (41)নং ধারা)

2 শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নীতি সমূহঃ⇒
(i) সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র অনধিক 14 বছরের বালক বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে (45 নং ধারা)
(ii) রাষ্ট্র: দুর্বল ও অনুন্নত অংশের বিশেষ করে তপশীলি জাতি ভুক্ত জাতি ও উপজাতি গুলির শিক্ষা অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার ঘটবে। (46 নং ধারা)
(iii) রাষ্ট্র চারুকলা এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত স্মারক চিহ্ন জায়গা ও জিনিসপত্র রক্ষনা বেক্ষন করবে (49 নং ধারা)
(iv) রাষ্ট্র চেষ্টা করবে যাতে গুরু, মোষ, ইত্যাদী গৃহ পালিত পশু এবং দুধ দায়ী ও ভারবাহী ও অন্যান্য পশু হত্যা করা বন্ধ হয়।

(৫) রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা নিয়ে যাতে ঔষধের প্রয়োজন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য মদ বা মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে, 42তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে আরো কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যথা-

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষন ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে, এবং
(খ) বন ও বন্য প্রাণী রক্ষণা বেক্ষণে উদ্যোগী হবে।

3) আইন ও প্রশাসন বিষয়ক নীতি সমূহ:--
(1) রাষ্ট্র, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে চেষ্টা করবে (50 নং ধারা)
(২) রাষ্ট্র সমগ্রভারতের সকল নাগরিকদের জন্য একটি প্রকার দেওয়ানী বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করবে (44 নং ধারা)

(3) রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের উদ্যোগী হবে এবং এই পঞ্চায়েত গুলির হাতে এরুপ ক্ষরতা অর্পন করবে যাতে এগুলি স্বায়ত্ব শাসনের এক একটি কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে (40নং ধারা)

(4). আন্তর্জাতিক শান্তিও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি সমূহঃ– (১)রাষ্ট্র আন্তরর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবে।
(২) রাষ্ট্র জাতি সমূহের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত ও সম্মান জনক সম্পর্ক স্থাপন করবে।
(৩) রাষ্ট্র আন্তরর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতি প্রতি শুল্ক প্রদর্শন করবে।
(৪) রাষ্ট্র শালিশীর মাধ্যমে আন্তরর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করবে (51 নং ধারা)

**নির্দেশ মূলক নীতি গুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ→

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি গুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে দুধরনের মতলক্ষ্য করা যায়, এক দলের মতে নির্দেশ মূলক নীতি গুলির কোনো বাস্তব মূল্য বা কার্যকারিতা নেই। কারন -(i) এই নীতি গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয় এবং সেই কারণেই রাষ্ট্র এগুলিকে কার্যকর করতে বাধ্য নয়।
(ii) নির্দেশ মূলক নীতিগুলিকে প্রয়োগযোগ্য করার জন্য কতক গুলি নীতি ও সদিচ্ছার ঘোষণার মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ করেছেন।
(i|i) নির্দেশ মূলক নীতিগুলির রুপায়ন রাষ্ট্রের ইচ্ছাও বিবেচনার উপর নির্ভর মিল বলে এগুলিকে নাগরিকদের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না,

(৪) এই নীতিগুলি অস্পষ্টতা ও পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট।
(v) স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর এই নির্দেশ দান মর্যাদা হীন কারও হতে পারে।

(৬) অভিজ্ঞতা থেকে দেখাযায় যে এই নীতিগুলি বিশেষ করে অর্থনৈতিক নির্দেশ গুলি পালনের ক্ষেত্রে সরকার প্রচন্ড ভাবে উদাসীন। অপর এক দলের মতে আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নাহলেও এই নীতি গুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না কারন -

(1) নির্দেশ মূলক নীতি গুলি আদালত কর্তৃক বলবতে যোগ্য না হওয়াতে অনেকে এগুলিকে সংবিধান রচিয়িতা দের নৈতিক উপদেশ ও রাজনৈতিক ইস্তাহার বলে বর্ণনা করেছেন। আইনগত মূল্য না থাকলেও এই নীতিগুলির রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্য যথেষ্ট আছে এই নীতি গুলিকে বাস্তবায়ন না করলে সরকারকে আদালতের নিকট জবাব দিহি করতে

হয়না ঠিকই। কিন্তু জনগণের নিকট অবশ্যই জবাব দিহি করতে হয়, শাসক গোষ্ঠী এই নিতি গুলি রূপায়নের ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখলে জনগন তাদের ক্ষমা করবেনা।

(২)কোনো একটি সরকারের সাফল্য নির্ভর করে সেই সরকার এই নীতি, গুলিকে কত খানি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর। ড. আম্বেদকরের মতে এই নীতি গুলি ক্ষমতাশীল দলের কেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

(iii) আইনগত বাধ্য বাধকতা না থাকলেও সরকার এই নীতি সম্পর্কে বহু নির্দেশই বাস্তবায়িত করেছেন। অথবা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন পশ্চিম বঙ্গসহ বেশ কয়েকটি রাজ্য পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা 14 বছরের অন্তর্দ্ধ বালক বালিকাদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ব্যাক্ত বিমা জাতীয় করন,কুটির শিল্পের প্রসার ইত্যাদী,

(iv) নির্দেশ মূলক নীতিম গুলিকে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করায় বোঝায় ভারতীয় সংবিধান প্রনেতাগন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় অর্থনৈতিক বাও আসাজিক ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিলেন।
(৫) এই নীতি গুলি ভারতের সংবিধান কে গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।
(vi) নির্দেশ মূলক নীতিগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গনতন্ত্রকে পরিপূর্ণতা দানে পুরোপুরী আগ্রহী,
(VII) নির্দেশ মূলক নীতি গুলির অন্যতম তাৎপর্য হল এই যে হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে না গিয়ে ও যে সমাজ বিপ্লব ঘটানো যায় নির্দেশ মূলক নীতিগুলি সেই সত্যের দিকে ইন্নীত দেয়।

সাম্প্রতিক কালে বিশেষ করে 1971 সালে 25তম সংবিধান সংশোধনি আইন পাশ হওয়ার সময় এই নীতি গুলিকে মৌলিক অধিকারের উপর স্থান দেওয়ার একটি প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, 1973 সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলা এবং 1980 সালে মিনার্ভা মিলস মামলায় প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় গুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নির্দেশ মূলক নীতি গুলিকে মৌলিক অধিকারের ওপর স্থান দেওয়ার এই প্রবনতাকে সুপ্রিম কোর্ট স্বাগত জানিয়েছে। কারণ এই নীতি গুলি জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সরকারকে সজাগ করে। এই নিতী গুলি হল ভারতীয় জনগণের নূন্যতম আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিক।

(5)ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলি ও পদমর্যদা আলোচনা কর?

উঃ ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভারত বর্ষে, মন্ত্রিপরিষদের চালিত শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এই শাষন ব্যবস্থায় অন্যতম বৈশিষ্ট হল একজন নাম সর্বস্ব শাসকের অবস্থিত ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন সেই নাম সর্বস্ব শাসক তথ্য নতভাবে তিনি প্রভুত্ব ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যত তিনি প্রধান মন্ত্রির নেতৃত্বাধিন মন্ত্রি পরিষদের মরা পরামর্শে এই সকল ক্ষমতা ব্যবহার করেন। সংবিধানে 53 (1) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "The executive Power the union shall be vested in The President"

এগুলি হল =→{1)শাসন সংক্রান্ত ক্ষয়তা
(2) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা,
(3) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা।
(৪)বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা।
(৫)জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (৬)অন্যান্য ক্ষমতা।

সংবিধানে 53 নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রের জারতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত থাকবে এবং রাষ্ট্র পতি দেশের সর্বচ্চো প্রশাসক হিসাবে সেই সকল ক্ষমতা নিজে অথবা তার অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। মন্ত্রি পরিষদের জারতীয় সীদ্ধান্ত এবং দেশের শাসন কার্যাধি সম্পর্কিত জাবতীয় সংবাদ রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রির কর্তব্য,।

রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যাপক তিনি যাঁদের নিয়োগ করেন তাঁরা হলেন – (i) প্রধান মন্ত্রি ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ।
(II) অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল গন।

(ii) ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল,
(৪) ভারতের সর্বোচ্চো ব্যায় নিয়ন্ত্রক পরীক্ষক এবং অভিটর জেনারেল।
(৫)কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কর্তৃক কৃত্যক কমিশনের সদস্যগন।
(VII) সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচার পতিগন।
(vii) অন্তঃরাজ্য পরিষদের সদস্য,
(ix) তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য একজন বিশেষ অফিসার রাষ্ট্র পাত তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতার মতো অপসারন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও ব্যাপক। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে রাজ্য পাল, মন্ত্রিদের কেন্দ্র ও রাজ্যের রাষ্ট্র কৃত্যের কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের অপসারণ করতে পারেন। অন্যদিকে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচার পতি, অডিটর জেনারেল এবং নির্বাচন কামিশনের নির্বাচনি কমিশনার সহ প্রমুখ ব্যক্তিদের অপসারনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টের সুপারিশ অনুযায়ী চলতে হয়।

রাষ্ট্রপতি হলেন সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধি নায়ক। দেশের স্থল, জল, বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন। অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনের ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির রয়েছে এক্ষেত্রে সংসদের অনুমতি প্রয়োজন হয়। তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। দেশের আনুষ্ঠা নিক প্রধান হিসাবে-রাষ্ট্রপতি বিদেশে রাষ্ট্র দূত প্রেরক করেন ও বিদেশ থেকে আগত কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের গ্রহণ করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি তাঁর নামেই সম্পাদিত হয়। তবে পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া তা বলবৎ হয় না। ভারতের কেন্দ্র শাষিত অঞ্চলগুলির শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির অধিনে পরিচালিত হয়। তাছাড়া প্রত্যক্ষ ভাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির বিষয়ে ও রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। রাষ্ট্রপতি কত গুলি বিষয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কমিশন গঠন করে থাকেন এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল অর্থকমিশন, অন্তরাজ্য কমিশন, ভাষা কমিশন। অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিশন প্রভৃতি। এছাড়াও রাজ্য গুলির কাছে, প্রয়োজন মতো, প্রশাসনিক নির্দেশ পাঠানোর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হয়েছে।

@ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা::--ভারতের রাষ্ট্রপতি আইন সভার অঙ্গ। তাঁর আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –
(1) অধিবেশন সংক্রান্তক্ষমতা :⇒ তিনি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বায়ান করেন এবং স্থগীত করতে পারেন। তিনি লোকসভার মেয়দ শেষ হওয়ার আগে তা ভেঙে দিতে পারেন, তবে এই সকল কার্যাবলি পালন করার আগে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নীতে হয়। অর্থবিল ছাড়া অন্য কোনো বিল নিয়ে পার্লামেন্টের দুইবাক্ষের মত জন্য অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে তিনি যৌথ অধিবেশন ডাকতে পারেন এবং এই পরিস্থিতির
অবসান ঘটাতে পারেন।

@মনোনয়ন প্রদানঃ —- রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় 12 জন সদ্যকে মনোনয়ন করতে দিতে পারেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা সমাজসেবা ইত্যাদী মধ্য থেকে মনোনীত করেন। এছাড়া ঈঙ্গভারতীয় সম্প্রদায়ের ২জন প্রতিনিদ্ধিকে তিনি মনোনীত করতে পারেন।

যৌথ অধিবেশনে ভাষন দানঃ —-তিনি পার্লা মেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষন দিতে পারে না। তিনি কোনো বিল বা অন্য কোনো বিষয়ে বাণী প্রেরন করতে পারেন।

বিলের সম্মতি দানঃ— পার্লায়েন্টের পাশ হওয়া প্রতিটি বিলে তিনি সম্প্রতিদিতে পারেন, নাও দিতে পারেন অথবা বিলটিকে পুনরায় বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন। বিলটি। দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতির কাছে এলে তাতে তিনি স্বাক্ষর দিতে বাধ্য থাকেন। এছাড়া অর্থবিল এবং সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত বিলে তিনি অসম্মতি জানাতে পারেন না। এছাড়া রাজ্য আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু ক্ষমতা রয়েছে, রাজ্য আইন সভায় পাশ হওয়া বিল রাজ্য পালের কাছে পাঠানো হয় এক্ষেত্রে তিনি বিলটিকে সমর্থন না করে রাষ্ট্রপতির কাছে সম্প্রতির জন্য পাঠিয়ে দেন।

রাষ্ট্রপতির বিল বাতিল করার ক্ষমতা হল ভেটো ক্ষমতা। অর্থবিল বা সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়া অন্য যে কোনো বিলে অসম্মতি জানানোর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে। এবং এটি করলে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। একে রাষ্ট্রপতির চরম ভেটো ক্ষমতা বলে। এছাড়া পার্লামেন্টে পাশ হওয়া কোনো বিলে সম্মতি বা অসম্মতি না জানিয়ে পুনরায় বিবেচনার জন্য পার্লা সেন্টের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন তখন তাকে স্থগীত কারি ভেটো বলে। আবার

পার্লামেন্টে কোনো বিল পাশ হওয়ার পর তার কাছে এলে তাতে সম্মতি জানা বা অসম্মতি জানানো, অথবা পুর্নব বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে বিলটি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার হয় না। ফেলে তিনি বিলটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করে রাখতে পারেন এবং তাকে পকেট ভেটো ক্ষমতা বলেন এছাড়া তিনি সংবিধান অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার দিন থেকে 6 সপ্তাহের ভিতরে সেই অর্ডিন্যান্স কে পার্লামেন্টে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় তা নাহলেঅর্ডিন্যান্স টি বাতিল হয়ে যায়।

@অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা: —সংবিধান অনুসারে তার সুপারিশ ছাড়া কোনো অর্থবিল লোক সভায় পেশ করা যায় না। এছাড়া ঋণ সংক্রান্ত তার অনুমতির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য সরকারের বাজেট অর্থ মন্ত্রীর মাধ্যমে তিনি পার্লামেন্টে উত্থাপিত করেন। আবার আকস্মিক ব্যায় কমানোর জন্য তাঁর তত্বাবোধানের দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। রাষ্ট্রপতি আকস্মিক ব্যায় কমানোর জন্য রাষ্ট্রপতি অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করেন। সে ক্ষেত্রে পার্লামেনে অনুমতি নিতে হয় এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যেগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টনে প্রতি 5 বছর অন্তর তিনি একটি অর্থকমিশন গঠন করতে পারেন,

@বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা : —রাষ্ট্রপতির বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচার প্রতিদের নিয়োগ করার ক্ষমতা, এদের পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অনুমতি নিতে হয়। এছাড়া ফৌজদারি মামলায় দণ্ডি ও ব্যক্তির দন্ডাদেশ স্থগীত রাখা বা হ্রাস করা অথবা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করার ব্যাপারে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির কে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন বা মৃত্যুদন্ত বাদ দিয়ে অন্যকোনো দন্ড দিতে পারেন।

@জরুরী অবস্থা সংক্রান্তজ্ঞতা: -সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষনা করতে পারেন যথা:-
(1) জাতীয় জরুরী অবস্থা (352)
(2) রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা (356)
(3) আর্থিক জরুরী অবস্থা (360)

@অন্যান্য ক্ষমতাঃ– তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের নিয়োগ চাকরির শর্তাবলি নির্ধারন করেন।
(২) সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বজায় রাখার জন্য তিনি নিয়মাবলি তৈরি করেন।
(৩) দিল্লির মুখ্যমন্ত্রি সহ মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন।
(৪)জন্ম ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে।

@পদমর্যদাঃ⇒ রাষ্ট্রপতি এই ব্যাপক ক্ষমতার জন্য তাকে কেউ কেউ প্রকৃত শাসক বলে মনে করেন কেন না তিনি প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করেন, এবং পদচ্যুত করতে পারেন। কিন্তু অনেকে রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলে মেনেনিতে রাজি নয় আম্বেদকর মনে করেন তিনি দেশের প্রধান কিন্তু শাসক শাসন বিভাগের প্রধান নন, তিনি মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য এছাড়া রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি তারই ক্ষমতা হীনতাঁরই প্রকাশ্য প্রমান। তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যদা নির্ভর করে বেক্তিত্ব, বিচক্ষনতা, যোগ্যতা, সর্বপোরি রাজনৈতিক পরিস্থির উপর পরিস্থতি কখনোও কখনোও রাষ্ট্রপতিকে শাসকের পর্যায়ের উন্নতি করে।

(6) ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যদা আলোচনা করো?

উঃ- ভারতের শাসন ব্যবসায় সর্বাধিক গুরুপূর্ণ পদের অধিকারী হলেন প্রধান মন্ত্রী, ইংলেন্ডের প্রধান মন্ত্রীর মতোই ভারতের প্রধান মন্ত্রী ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় বাস্তব শাসন বার্তিত্বের অধিকারী এবং মন্ত্রীসভার কেন্দ্র মনী। প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যদা বিচার করলে তাকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো শক্তিশালী বলে মনে করা হয়।

ভারতের সংবিধানে 74 (1) নং ধারা অনুসারে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য করাও পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রী সভা থাকবে এবং এই মন্ত্রীসভার শীর্ষে থাকলেও প্রধান মন্ত্রী সংবিধানে 75 নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র পতির দ্বারা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করবেন। এই মন্ত্রীসভা ভারতের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী।

1) রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক :⇒ প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু এই নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকেন। প্রধান মন্ত্রী লোকসভার কাছে দ্বায়িত্বশীল। তাই লোকসভার আস্থাভাজন নন এমন কোনো

ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করা যায় না। তবে লোকসভায় কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে পারেন, রাষ্ট্রপতি ভিন্নদলের জোটের নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বায়ান করতে পারেন। যদি কোনো ব্যক্তি পার্লামেন্টের সদস্য না হয়ে প্রধান মন্ত্রী হন তাহলে 6 মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়।

মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর হলেন রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শ দাতা, কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর গুলির কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সরকারের অন্যান্য পদাধিকারীকে নিযুক্ত করেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত
হন। প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রধান: মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে যোগ সূত্র হিসাবে কাজ করেন। 78 নং ধারা অনুসারে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব এবং মন্ত্রী সভার যে কোনো সীদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানান, ভারতের শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত যাবতীয় ক্ষমতার প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রনের অধিকারী প্রধানমন্ত্রী সংবিধানিক দ্বায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

2) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীসভার সম্পর্কঃ –

ভারতের মন্ত্রীসভার মূলভিত্তি হল প্রধান মন্ত্রী, তাকে প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রীসভার কেন্দ্র মনি বলা হয়। প্রধান মন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রী সভার উত্থান ও পতন হয়। মন্ত্রীসভা গঠনের তার ক্ষমতা রয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রীগণ তাঁর পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। মন্ত্রীসভার কোন কোনমন্ত্রী ক্যাবিনেটে স্থান পাবেন অথবা কারা রাষ্ট্র মন্ত্রী হবেন বা উপমন্ত্রী হবেন এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সীদ্ধান্ত চূড়ান্ত মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন ও পূর্নর বন্টন প্রধান মন্ত্রী করে থাকেন। প্রধান মন্ত্রীর অনুগ্রহ ভাজন কোনো ব্যক্তি মন্ত্রী সভায় স্থান পেতে পারেন আবার বিবাগ ভাজন হলে পদত্যাগ করতে হয়। তিনি যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগের সুপারিশ করতে পারেন। এমন এ ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভায় আনতে পারেন। প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীসভার সভায় সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রীসভার কর্মসূচী নির্ধারণ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নীতিগত বিরোধ মীমাংসার দ্বায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীর মূলত প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে নীতি নির্ধারণ হয়ে থাকে অনেক সময় প্রধান মন্ত্রী অল্প কয়েক জন বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নীতি গ্রহণ করে একে প্রধান মন্ত্রীর কিচেন -ক্যাবিনেট বলে। তবে প্রধান মন্ত্রীকে দলের নেতাদের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। এটি নির্ভর করে তাঁর প্রতি দলীয় সমর্থন, ব্যক্তিত্ব, শক্তির উপর নির্ভর করে।

3) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্কঃ–

প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সংখ্যাগরীষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে পার্লামেন্টের কাজকর্মে নেতৃত্ব দেন, অবশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সদস্য না হয়ে রাজ্য সভার সদস্য হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তিনি লোকসভায় উপস্থিত থাকতে পারেন। বিতর্কে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু লোকসভার সদস্য না হলে ভোট দিতে পারেন না লোক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করত হয়। লোকসভার নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী আইন সভায় নেতৃত্ব দেন এবং আইন তৈরির ব্যাপারে ভূমিকা তৈরি করেন। পার্লামেন্টের কার্যতালিকা তার নিয়ন্ত্রনে থাকে। তিনি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বায়ান করতে পারেন অথবা স্বগীত করতে পারেন অধিবেশনের দিন, মেয়াদ, আলচ্যসূচী প্রভৃতি বিষয় তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারেন। সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তার চূড়ান্ত, কোন মন্ত্রী পার্লামেন্টের বিতর্ক সময় বিরোধী পক্ষের আক্রমনে অসুবিধায় পড়লে প্রধান মন্ত্রী এগিয়ে আসেন। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দেন। গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া এবং জরুরী কোন ঘোষণা দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী। তিনি সরকারের মুখপাত্র হিসাবে পার্লামেন্টের সরকারের নীতি ও কার্যক্রম পেশ করেন। লোকসভায় স্পিকারের সঙ্গে সহযোগিতা প্রধানমন্ত্রীর লোকসভায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। এবং সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এক কথায় ভারতের আইনসভার প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

4. প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে তার দলের সম্পর্ক:-

প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। দলীয় আনুগত্য হলো প্রধানমন্ত্রী প্রাধান্যের মূল ভিত্তি। সংসদের এবং বাইরের দলের সাংহতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে সব সময় যত্নবান থাকতে হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থক তার ক্ষমতার উৎস। তাই দল প্রধানমন্ত্রীর কাছে মোস্য নেতৃত্ব এবং দলের নির্ধাবনা প্রতিশ্রুতি পূরনে আশা করে। প্রকৃতপক্ষে শাসন দলের ভাগ্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দানের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

সাধারণ নির্বাচনে তার দলের যাতে আবার শসমর্থন পায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী কে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচি জনগণের সামনে প্রচার করেন। নির্বাচনের দলকে জয় মুক্ত করার জন্য নির্বাচনা প্রচারের অংশ নেন। এবং দলীয় নীতি সরকারের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করেন এক কথায় প্রধানমন্ত্রী শুধু সরকারের নেতা হিসাবেই কান করেন না তিনি দলের নেতা হিসেবে দলের সার্থক রক্ষার চেষ্টা করেন।

5. জনগণের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী:---

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুধু সরকারের নেতা বা দলের নেতা নন, তিনি দেশের নেতা বলেও স্বীকৃতি পান। জহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী বা লালবাহাদুরশাস্ত্রী কোন দলের লোক সে বিচার না করে ভারতের মানুষ তাদের জনগণের নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ও জনমোহিনী শক্তির ওপর তার পদমর্যাদা নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী জনসংযোগের মাধ্যমগুলির ব্যবহার করে জনগণের কাছে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ পান। যথাযথভাবে সেই সুযোগ ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী জনগণের মনে জাতীয় নেতা হিসেবে স্থান করে নিতে পারেন। এই ভাবমূর্তি যে প্রধানমন্ত্রী যতখানি উজ্জ্বল সেই প্রধানমন্ত্রী তার প্রধানমন্ত্রী জীবনে ততখানি সফল বলে বিবেচিত হন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি ভারতের শাসন বিভাগের সবর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তবে তার সংবিধানিক ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানে সামান্য উল্লেখ আছে। 74(1),75(1)এবং 78 নং ধারাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে যে সামান্য উল্লেখ রয়েছে তা প্রধানমন্ত্রীর বিশাল ক্ষমতার পরিচালক নয়। তিনি অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেন তার মূলনীতি প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন। পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইসব ক্ষমতার উল্লেখ সংবিধানে নেই। তাই বলা যায় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর মতই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির কথা ও বহিহ্যের ওপর নির্ভরশীল।

(7) ভারতীয় সংবিধানে দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করো, অথবা ভারতীয় সংবিধানে দর্শন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উঃ - প্রত্যেক দেশের সংবিধানে একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি থাকে। সাধারণ ভাবে কোনো দেশে সংবিধান এক রচয়িতিতারা যে আদর্শ ও লক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই আদর্শ ও লক্ষ্য কে সেই দেশের সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানে রচয়িতা দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুলি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে। বিচার পতি সুব্বারাও মন্তব্য করেন, ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি ভারতীয় সংবিধানে প্রস্তাবনার মধ্যে নিহিত আছে।

প্রস্তাবনায় উল্লেখিত ভারতের সংবিধানে মৌলিক আদর্শ গুলি হল গনতন্ত্র, সমাজ তন্ত্র, ধর্মনীরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, অংশে এই সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদী। সংবিধানের মূল অংশে এই আদর্শ রুপায়নের কথা বলা হয়েছে। এই সব আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ কিছুটা সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য আদর্শ থেকে এসেছে। ভারতে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এরা হলেন, মিল, বেন্থাস, স্পেনসার, প্রমুখরা।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের আদর্শছাড়াও ইউরোপে সংগঠিত কয়েকটি যুগান্তকারী গঠন ভারতীয় সংবিধানে দার্শনিক ভিত্তি রচনার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল ইংল্যান্ডের গৌরব ময় বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব,রুশ বিপ্লব, প্রভৃতি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রকৃতি যে আদর্শ গুলির ভারতীয় সংবিধানে ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, সেই গুলিকে এই সব বিপ্লবের পিছনে কাজ করে ছিল। এই সব আদর্শগুলি মূলত পাশ্চাত্য ভাবধারা থেকে গ্রহণ করা হলে এই আদর্শ গুলি, ভারতে সনাতন চিন্তাধারাতে পরিলক্ষিত হয়। বেদ, উপনিষদে এই সমস্ত আদর্শের উল্লেখ আছে ।গনসার্বভৌমিকতা সাধারণতন্ত্র ইত্যাদি পরিচয় রামায়নে পাওয়া যায়। ভারতের সংবিধানে অপর দুটি মৌলিক আদর্শ হল - ধর্মনীরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। মূল সংবিধানে প্রস্তাবনায় এই দুটির উল্লেখ না থাকলেও 1976 সালে 42তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই দুটি আদর্শকে প্রস্তাবনায় যুক্ত করা হয়। এগুলি মূলত প্রাচীন ভারতের সমাজে লক্ষ্য করাগেছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শের মূল কথা হল ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মের ব্যাপারে ভারত

চিরকালই নিরপেক্ষ থেকেছে। আবার সমাজতন্ত্রের আদর্শটি রাশিয়ার বিপ্লব থেকে গৃহীত হলেও প্রাচীন ভারত বর্ষে এই নীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

শুধু প্রস্তাবনায় নয়, ভারতীয় সংবিধানে কার্যকারি অংশের মধ্যেও সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তির প্রকাশ ঘটেছে। সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি আদর্শগুলিকে মৌলিক অধিকারের স্থান দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের থেকে বাদ দেওয়া হলে এটি স্বীকৃত পেয়েছে। এছাড়াও সাম্য ও ন্যায় বিচারের আদর্শকে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে চতুর্থ অধ্যায়ে কতগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এই নীতিগুলির মধ্যে জনকল্যান কর রাষ্ট্রের ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, নিরক্ষতা দূরীকরণ, মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি যে আদর্শ গুলি ভারতীয় সংবিধানে কার্যকারী অংশে স্থান পেয়েছে তাতে পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের সংমিশ্রন ঘটেছে।

1.জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ করো?

উঃ- জেলা পরিষদের অবস্থান হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আইন অনুসারে সর্বোচ্চ পর্যায়, জেলা পরিষদ যেসব সদস্য নিয়ে গঠিত হয় থাকে তারা হলেন - সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি গন ভোটদাতা দের দ্বারা নির্মিত প্রতিটি ব্লক থেকে সর্বাধিক তিনজন সদস্য এবং(সংশ্লিষ্ট জেলায় ভোটদাতা হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকলেও মন্ত্রীরা এই সদস্য হতে পারে না) তাছাড়া মন্ত্রী ছাড়া রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভার সংশ্লিষ্ট জেলার সদস্যরা এর সদস্য হতে পারেন।

ক. কার্যবলি বা ক্ষমতা:-

সমন্বয় মূলক ও পরামর্শ দান সংক্রান্ত কাজ:-জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে অবস্থিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলির যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও পরামর্শদান মূলক কাজ করে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে, তাছাড়া উন্নয়নমূলক কাজ করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে জেলা পরিষদের পরামর্শদান করে থাকে।

খ. প্রকল্প গ্রহণ ও আর্থিক সাহায্য দান:-মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প, জল সরবরাহ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, যোগাযোগ, নারী ও শিশু কল্যাণ, বয়স্ক শিক্ষার সামাজিক সমৃদ্ধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ করা অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান জেলা পরিষদের কাজের মধ্যে পড়ে।

গ. অনুদান দেওয়া:-জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি গুলিকে অনুদান দিতে থাকে, তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য প্রদান করে থাকে।

ঘ. রক্ষণাবেক্ষণ-জেলা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রক্ষণাবেক্ষণ মূলক কাজ, এই ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ গ্রামের হাট বাজারের মালিকানা অধিগ্রহণ করে থাকে ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

ঙ. বাজেটের পরীক্ষা করা:-জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে অবস্থিত পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট পরীক্ষা করে দেখে ও তার অনুমোদনের জন্য কাজ করে থাকে।

চ. ত্রাণমূলক কাজ:-জেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা জনিত কারণে তাদের কে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা ও ওই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবহারের যেসব অর্থ প্রদান করে থাকে সেইসব অর্থ যথাযথভাবে আদৌ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে জেলা পরিষদের পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে ।

জেলা পরিষদ আরও কিছু কাজ করে যেমন :- অর্পিত দায়িত্ব পালন করা , জনকল্যাণকর সংগঠন পালন করা, জনসংস্কৃতিক কাজ দেখাশোনা করা,

2.ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি কি উল্লেখ কর?

উঃ-যুক্তরাষ্ট্র বলতে সেই শাসন আঞ্চলিক সরকার গুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেওয়া হয় এবং সংবিধানের উল্লেখিত আইনের দ্বারা উভয় সরকারের শাসন কার্য পরিচালনা করেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য গুলি হল:-

ক. লিখিত সংবিধান:-ভারতীয় সংবিধান গণপরিষদ দ্বারা গঠিত লিখিত সংবিধানে সংবিধান হলো ভারতের শাসন পরিচালনার একটি লিখিত দলিল, এই সংবিধানের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা, নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি,

খ. কেন্দ্রীয় প্রবণতা:-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় প্রবণতা এখানে জাতীয় ঐক্য ও সংগীতি সামগ্রিক ভাবে জাতীয় স্বার্থদিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হয়েছে।
গ. কেন্দ্রীয় রাজ্য সমন্ব:-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকলেও অঙ্গরাজ্য গুলির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাই জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্য গুলি যেমন কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করে তেমনিভাবে অন্য রাজ্যের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাই বলা যায় যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বয় সাধন হয়েছে।
ঘ. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত:-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, স্বাধীন ও কেন্দ্রীয় আদালত অবস্থান ভারতের এই ধরনের আদালত হল সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যা কর্তা হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা।
ঙ. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উৎস:-ভারতীয় সংবিধান হলো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উৎস, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সংবিধানে বর্ণিত নির্দিষ্ট এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়।
চ. ক্ষমতার বন্টন:-যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা বন্টন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেসব ব্যবস্থা থাকার কথা সবগুলি প্রায় ভারতে রয়েছে এই ব্যবস্থায় এমনভাবে সংবিধানিক নীতি গ্রহণ করা হয় রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক বা আলাদা রাষ্ট্রের তৈরি করতে না পারে, তবে ভারতের একটি সর্বাধিক ভাবে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় নয় তেমনি একে একটি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলা যায় না।

3.ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক বা রাজ্য ক্ষমতা বন্টন সম্পর্কে আলোচনা কর?
উঃ -যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যে গুলোর মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানের উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্যগুলি যাতে কেন্দ্রের দিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাকিয়ে দেখতে দেওয়া হয় তার জন্য রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের বিষয়টিকে আলোচনার সুবিধার্থে চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন,
কেন্দ্রীয় অনুদান
ঋণ গ্রহণ করা,
অর্থ কমিশন,
ক. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মধ্যে রাজ্যসম বন্টন:-ভারতবর্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কে দুটি তালিকার মাধ্যমে বন্টন করা হয়েছে। এই দুটি তালিকা হল-রাজ্যতালিকা ও কেন্দ্রীয় তালিকা, এই দুই তালিকার সংবিধানের ৭ তম তপশীলে উল্লেখ আছে। সম্পূর্ণ রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত বিষয় সংখ্যা হলো ১৯ টি, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূমি রাজস্ব, বিদ্যুৎ কর যানবাহন কর আরোপের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নেই, যেমন:-
(১) রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির ওপর রাজ্য সরকারের কর ধার্য করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের দ্বারা অনুমোদন সাপেক্ষ,
(২) আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে ক্রয় বিক্রয় এর ওপর রাজ্য সরকার কোন বিক্রয় কর আরো করতে পারেনা।
(৩) রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা থাকাকালীন সময় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন সম্পর্কিত ২৬৮ ও ২৬৯ নং ধারায় যে কোনো বিষয়ে প্রয়োগ বন্ধ রাখতে পারেন।

কেন্দ্র সরকারের ১৩ টি বিষয় আছে। কেন্দ্রীয় তালিকা ভুক্ত বিষয় থেকে অর্থ এককভাবে পুরোপুরি ভোগ করে না। কখনোও সমগ্রহ আয় বা কখনোও আয়ের অংশ রাজ্যগুলিকে দিতে হয় দিতে হয়, যেমন:-
(১) কতকগুলি কর আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার আরো করে ও সংগ্রহ করে আয়কর ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক এই শ্রেণি ভুক্ত এক্ষেত্রে বন্টনের নীতি অর্থ কমিশন দ্বারা নির্ধারিত হয়।
(২) কতকগুলি কর আছে যা আরো করে কেন্দ্র ও সংগ্রহ করে ও কেন্দ্র, কিন্তু সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হয়, এই বন্টনের নীতি নির্ধারিত হয় পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে, যেমন-রেল যাত্রী, সংবাদপত্র ও বিজ্ঞানের উপর কর এই শ্রেণি ভুক্ত,
(৩) কতগুলি কর আছে যা আরোপ করে কেন্দ্র কিন্তু সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্যগুলি, যেমন-

খ. কেন্দ্রীয় অনুদান:-কেন্দ্র করের একটি অংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে বিভাজনের পরে ও সব রাজ্যের সম্পদ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নাও হতে পারে। সেই কারণে সংবিধানের এই বিষয় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় প্রতিবছর সেইসব রাজ্যকে সহায়তা ,অনুদান দেবে, যেসব রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে পার্লামেন্ট ঠিক করে দেবে বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলের জন্য আসামকে বিশেষ অনুদান দেবে।

গ. ঋণ গ্রহণ করা:-কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যে থেকে বা বিদেশ থেকে ঋণ নিতে পারে, তবে পার্লামেন্ট সময়ে সময়ে যে সীমা ঠিক করে দেবে সেই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ এই ক্ষমতার প্রয়োগ করবে.। কিন্তু কোন রাজ্যের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা কতগুলি সংবিধানিক নিয়ম সাপেক্ষ, যেমন:-কোন রাজ্য সরকার ভারতের বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না, আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণশোধ না করে পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ছাড়া গ্রহণ করতে পারে না।

ঘ. অর্থ কমিশন:-ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য তিনটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এগুলি হল:-অর্থ কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, সংবিধানের ২৮০ নং ধারায় রাষ্ট্রপতি সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ২ বছরের মধ্যে এবং তারপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন নিয়োগ করবেন, একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়, অর্থ কমিশন সংবিধান অনুসারে মূলত দুটি দায়িত্বে পালন করে থাকে।–

(১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মধ্যে বন্টন যোগ্য রাজস্বের ভার নির্ধারণ করা।

(২) অঙ্গরাজ্য গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুদানের নীতির নির্ধারণ করা, অর্থ কমিশন রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে, তাই কেন্দ্রীয় এই কমিশনের সুপারিশ মানতে না চাইলে রাজ্য বন্টনের এই সুপারিশের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

*মূল্যায়ন:- রাজস্ব বন্টন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে এক কথায় বলা যায় যে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলি থেকে অধিক শক্তিশালী ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এদের দ্বারা রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন আর্থিক পরিকল্পনার রূপায়ণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার গুলি কেন্দ্রীয় দিকে তাকিয়ে থাকে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা রাজ্য গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

4.ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

উঃ -যেকোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা র কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার গুলির মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা জন্য উভয় সরকারের প্রশাসনিক বিষয় এর গঠন ও ক্ষমতার বিভাজনের প্রয়োজন হয়, ভারতীয় সংবিধানের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্ক কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র রাজ্য প্রশাসনিক এক্তিয়ার সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩, ১৬২ এবং ২৫৬ থেকে ২৬৩ নং ধারা গুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. ৭৩ নং ধারা:-ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ নং ধারা অনুসারে পার্লামেন্ট যেসব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার ও ঠিক সেই সব বিষয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন, তাছাড়া ভারত সরকার কোন সন্ধি বা চুক্তির ব্যাপারে যেসব ক্ষমতা ভোগ করে থাকে, সেইসব বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার প্রসারিত।

খ. ১৬২ নং ধারা:-সংবিধানের ১৬২ নং ধারা অনুসারে কোন রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেবল তার নিজস্ব রাজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে যে বিষয়ে ক্ষমতা ভোগ করে থাকে সেই সব ক্ষেত্রে কার হাতে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব বেশি থাকবে সেই বিষয়ে সন্দেহ দেখিতে পারবে, সাধারণভাবে রাজ্যগুলির হাতে এই ধরনের বিষয়ের কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকলেও পার্লামেন্ট আইন করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বেশি ক্ষমতা দিতে পারে।

গ. 256 নং ধারা:-সংবিধানের ২৫৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের দ্বারা আইন ও প্রচলিত অন্যান্য আইনের সঙ্গে যোগ রেখে প্রয়োগ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে দরকার মনে হলে রাজ্য সরকার গুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ রাজ্য সরকার মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

ঘ. ২৫৭ নং ধারা:-ভারতীয় সংবিধানে 257 নং ধারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গুলির মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা বিষয়ের কতগুলি উপধারা ২৫৭ নং ধারায় সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, সংবিধানের 257 নং ধারায় উপধারা সম্পর্কে যে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিভাজনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল-

২৫৭ নং(১):- প্রতিটি রাজ্য সরকার রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা এমনভাবে কার্যকর করবে যাতে করে কেন্দ্রীয় সরকার অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

২৫৭ নং উপরহারা (২):-জাতীয় স্বার্থে যদি গুরুত্ব পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) রাজ্যের অভ্যন্তরে বলকর সংরক্ষণের ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ নির্দেশ দিতে পারে,

(৪) এই ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় নির্দেশ মতো রাজ্য সরকার গুলিকে কাজ করতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ হলে এবং এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের মধ্যে বোঝাপড়া করা যদি সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের বিচারপতির বিষয়টি নিষ্পত্তি জন্য একজন শাসন নিযুক্ত করতে পারে না।
ঙ. ২৫৮ নং ধারা:-সংবিধানের ২৫৮ নং ধারায় দুটি উপধারাতে প্রশাসনিক সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ আছে, যথা ২৫৮ নং ধারায়-
(১) রাজ্য সরকার তার সম্পত্তিতে রাষ্ট্রপতির কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগ কোনো বিষয়ে বা কোনো বিভাগের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের অপর বিনা স্বার্থে কতগুলি দায়িত্ব দিতে পারেন।
(২) পার্লামেন্টের যে কোন বিষয়ের আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্র সরকার কে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হাতে দিতে পারেনা.।
চ. ২৬২ নং ধারা:-অন্তরাজ্য নদী এবং নদী উপত্যকার বিষয়ের কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে মীমাংসার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সেই ক্ষেত্রে অজিত ক্ষমতার অধিকারী। ভারতীয় সংবিধানের ২৬২ (১ এর ২) নং উপধারায় সেই সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।
(১) যদি নদী ও নদী উপত্যকা গুলি জলে র বন্টন ও ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের কোনো বিতর্ক অন্তররাজ্যে ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাহলে পার্লামেন্টের প্রাণিত আইনের দ্বারায় তা হবে।
(২) এই ধরনের কোন বিরোধ বা অভিযোগের বিষয়গুলি আদালতে এক্তিয়ার বহিযভূত বিষয়ে রাখতে পারে।
ছ. ২৬৩ নং ধারা:-সংবিধানের ২৬৩ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অথবা রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে কোন বিতর্ক দেখা দিলে কেন্দ্র তখন অন্ত রাজ্য পরিষদ গঠন করবে এবং এই বিতর্ক কারণ অনুসন্ধান করবে ২৬৩ নং ধারা অনুযায়ী।
(১) কারণ অনুসন্ধান ও পরামর্শ দান:-যখন রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে তখন এই ধারা অনুসারে এই বিরোধের অনুসন্ধান করবে এবং রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেবে।
(২) অন্তরাজ্য পরিষদ গঠন:-কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বা সকল রাজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে কোনো বিতর্ক হলে সেগুলির মধ্যে জন্য এই অন্তরাজ্য পরিষদ গঠন করা যাবে।
সমালোচনা:-ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক বিষয়ে অনেক সমালোচনা করছে, তাদের মতে এই ক্ষমতা বন্টনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা অধিক শোষণ ক্ষমতা অধিকারী করা হয়েছে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া জরুরি অবস্থা জারি থাকাকালীন সময় রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপর কেন্দ্রীয় অধিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে, যার ফলে এই বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী বলে হয়ে থাকে।
মন্তব্য:-ভারতের কেন্দ্র, রাজ্য ও ক্ষমতার বন্টন সমস্যা থাকলেও ভারত হল একটি বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতি লোকজন নিয়ে গঠিত, এখানে বিচ্ছিন্নতা বাদী নামা শক্তি কাজ করে, তাই এই ধরনের পরিস্থিতিকে ভারতের ঐক্য ও সংহতির জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন, অন্তরাজ্য পরিষদ, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, জাতীয় সংগৃহীত পরিষদ, সর্বভারতীয় চাকরি ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রাজ্য সহযোগিতার দ্বারা ভারতের সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় রাজ্য বিতর্কের বদলে সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

5. ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুলির আইন-অনুহস্তান্তর ক্ষমতা বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করো?

উঃ -1935 সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিনের রচয়িতা গণ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন। এই আইনে তিনটি তালিকার কথা বলা হয়েছিল – কেন্দ্রীয় তালিকা রাজ্য তালিকা, যুগ্মতালিকা, সংবিধানে উল্লিত এই তিনধরনের তালিকাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল এগুলি হল -

(i) কেন্দ্রিয় তালিকা:- যেসব বিষয়ে সঙ্গে সমগ্রদেশের মানুষের স্বার্থ জড়িত সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার। এই কেন্দ্রীয় তালিকায় সমনে 97 টি বিষয় যুক্ত করা হয়েছিল, বর্তমানে এই তালিকায় ১০০টি বিষয় আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় গুলি হল - পতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, ডাকঘর, ইত্যাদী বিষয়।

(ii) রাজ্য তালিকাঃ- মূল সংবিধানের রাজ্যতালিকার অন্তরভুক্ত বিষয়ছিল ৬৬ টি, কিন্তু পরবর্তী কালে তা কমিয়ে করা হয়েছে, ৬১টি, রাজ্য সরকার এই সব বিষয় আইন প্রণয়ন করার অধিকারী, রাজ্যতালিকা ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি বিষয় হল -(ক) রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ,খ) বিচার ব্যবস্থা ,(গ) কৃষি আরকার, (ঘ) রাস্তাঘাট বিষয়ক ব্যবস্থা, (ঙ) বিক্রয়কর ,(চ) যানবাহনের ওপরকার ইত্যাদী।

(Iii) যুগ্মতালিকাঃ- ভারতের সংবিধানে এমন কিছুর বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের উভয়ই যৌথভাবে আইন প্রয়োগ করার অধিকারী। বর্তমানে ৫২টি বিষয় এই তালিকার অন্তরভুক্ত এই তালিকার কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাহলে কেন্দ্রের আইনটি বেশি গুরুত্ব পারে। এই তালিকার অন্তরভুক্ত বিষয় গুলি হল –

(১) বিহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে বিষয়। (2) সামাজিক নীরাপত্তা ,(৩) শ্রমিক সংঘ ,(4) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ,(5) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ,(৬) সংবাদপত্র ইত্যাদি।

সংবিধানে 245 নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে অর্পিত হয়েছে। তাছাড়া 245 নং ধারা অনুযায়ী,আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পার্লামেন্টে বা রাজ্য আইন সভাগুলিকে সংবিধানে ব্যাপারে মধ্য থেকে রাজ্য কে ধরতে হয়। ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার গুলির মধ্যে আইন বিষয়ক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবনতা অত্যন্ত বেশি কোন না-

প্রথমত:--প্রাথমিক বন্টন ব্যবস্থাতে অধিক সংখ্যক ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া তিনটি তালিকা বর্হিভূত সকল ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে যার ফলে কেন্দ্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় :- স্বাভাবিক বা অস্বাভিক কোনো অবস্থায় কেন্দ্রকে রাজ্যতালিকায় হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়া হয় রাজ্যগুলির আইন বিষয়ক ক্ষমতা আরো সংকুচিত হয়েছে / করে গেছে।

তৃতীয় :- বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্য আইন প্রয়োগ করার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দরকার হয়। এই ব্যবস্থাত ও কেন্দ্রের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। যাইহোক, ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আকার জরুরী অবস্থা থাকাকালীন সময় রাজ্যগুলির ক্ষমতা কার্য হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ক্ষেত্রে বাধা বলা যায়। অনেকে মনে করেন যে 249 ধারাটিকে কেন্দ্র তথা রাজ্যসভা জাতীয় স্বার্থের অজুহাত দেখিয়ে স্বর্কন স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই অসীম ক্ষমতাকে অনেক রাজনীতিবীদগণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভূষিত করতে আপত্তি তুলে ছিলেন। (K.C হেয়ার, K.P মুখার্জী) রাজনীতিবিদ নন।

(6) ভারতের রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা গুলি কি কি লেখ?

উঃ - জরুরী অবস্থা:- ভারতে যদি কোনো সংকীর্ণতা কালিন অবস্থার তৈরি হয় তাহলে তা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে এর জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে সবধরনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাকে বলা হয় জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত অবস্থা। তবে, জরুরী অবস্থা বলতে কী সে সম্পর্কে পরিষ্কার করে উল্লেখ নেই, ভারতে তিন ধরনের জরুরী অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়ে এগুলি হল-

(i) জাতীয় জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা
(২) শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষরতা।
(৩)আর্থিক জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষরতা।

(১) জাতীয় জরুরি অবস্থা (352) :- সংবিধানে 352 নং ধারা অনুসারে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। কয়েকটি কারণে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে যেমন – যুদ্ধের ফলে দেশের মধ্যে কোনো বিদ্রোহ দেখা দিলে বাইরের কোনো দেশ ভারত আক্রমণ করলে, রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। বাইরের আক্রমন জনিত কারণে ভারতে দুইবার জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল যথা- 1962 ভারত এবং চিনের মধ্যে ও 1971 ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এই ধরনের জাতীয় অবস্থা জারি হয়েছিল। তাছাড়া অভ্যন্তরীন বিদ্রোহের জন্য 1975 সালে একবার জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল।

পার্লামেন্টের অনুমোদন:-- এই ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষনার সংসদের উভয় কক্ষের পৃথক ভাবে এক মাসের মধ্যে অনুমোদন করতে হয়। অনুমোদনের জন্য প্রতিটি কক্ষে মোট সদস্যের অর্ধেক এবং উপস্থিত মোট ভোটদানকারী সদস্যের ২/৩ অংশ সমর্থন লাগবে। এই ভাবে অনুমোদন না হলে এই ঘোষনার এ মাসের পর জরুরী অবস্থা অকার্যকর হবে যাবে।

মেয়াদঃ- জরুরী অবস্থা ঘোষণা যথাযথো ভাবে অনুমোদিত হলে একবারই - 6 মাস জারি থাকবে, তারপর সংসদের উভয় কক্ষে একই পদ্ধতিতে অনুমোদিত হলে আবার 6 মাস চালু থাকবে, এই জরুরী অবস্থা সর্বাধিক কতদিন পর্যন্ত জারি রাখা যাবে সেই বিষয় সংবিধানে পরিষ্কার কিছু বলা নেই।

প্রত্যাহার :- রাষ্ট্রপতি একটি পৃথক ঘোষণার দ্বারা জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করতে পারে না। আবার লোকসভায় ১/১০ অংশ সদস্য জরুরী অবস্থার বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য Notice দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 14 দিনের মধ্যে তার ব্যাখ্যা করতে হয়।

ফলাফলঃ- এই ধরনের জরুরী অবস্থা জারী থাকার সময় দেশের শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাবে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নায়ক তান্ত্রিক ব্যবস্থার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক কেন্দ্রীক ব্যবস্থার পরিনত হয়।
(১) রাজ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা কী ভাবে চলবে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ সেই সম্পর্কে নির্দেশদিতে পারে। অন্তরাজ্য গুলি সেই নির্দেশ গুলি পালন কর তে বাধ্য থাকাবে (353(A) ধারা অনুযায়ী)
(২) রাষ্ট্রপতি বিশেষ আদেশদ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক বন্টনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারে, (354 ধারার)
(৩) লোকসভায় পাঁচ বছরের মেয়াদে এক বছর করে বাড়ানো যায়। তবে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর এই বর্ধিত মেয়াদ ৬ মাস এবং বেশি থাকে না।
(৪) 44তম সংবিধান অনুসারে জরুরী অবস্থার ২০-21 নং ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার কোনোভাবে নিয়ন্ত্রন করা থাকবে না।

(২) শাসনতান্ত্রিক অচল ব্যবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা (৩৫৬ নং ধারা):-ভারতীয় সংবিধানে 356 নং ধারায় রাজ্যে শাসন তান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্য পালের কাছ থেকে জানতে পারেন যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সংবিধানিক অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা চালানো সম্ভব হচ্ছে না তাহলে তিনি যে জরুরী অবস্থা জারি করেন তাকে বলা হয় শাসন তান্ত্রিক অচল অবস্থা বা রাষ্ট্রপতি শাসন।

অনুমোদন:- রাজ্যের শাসন তান্ত্রিক-অচল অবস্থা ঘোষনা পার্লামেন্টের উভয়রাক্ষে ২ মাসের মধ্যে আলাদা ভাবে অনুমোদিত হতে হয় তখনই শাসন তান্ত্রিক।

মেয়াদঃ- রাষ্ট্রপতি শাসন পার্লমেন্টের উত্তর কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়ে 6 মাস কার্যকরি থাকে এবং পরে আরও 6 মাস তার মেয়াদ বাড়ানো হয়।

ফলাফলঃ- রাজ্যে শাসন তান্ত্রিক অচল অবস্থা চালু হলে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়।
(i) রাজ্য আইন সভার ক্ষমতাগুলিকে পার্লামেন্ট নিজ এলাকার বা এক্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।
(২) পার্লামেন্ট কার্তিক আইন প্রনয়ন করতে পারে ওই সকল রাজ্য।
(3) কোনো রাজ্যে শাসন তান্ত্রিক অচল অবস্থা জারি করার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি -
(৪) কোনো রাজ্যের অচল অবস্থা ঘোষিত হলে ওই রাজ্যের জন্য বাজেট ও অর্থবিল পাশ করতে পারে।

(৩) আর্থিক জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা (৩৬০) নং ধারা:-ভারতীয় সংবিধানে 360 নং ধারায় রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণার কথা বলা হয়েছে, সমগ্র ভারত অথবা ভারতের কোনো অংশে আর্থিক সুনাম ব্যাহত হলে বা সেই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন তা হলে তিনি সমগ্র ভারতে বা সেই অংশে যে জরুরী অবস্থা জারি করাবেন তাকে বলা হয় আর্থিক জরুরী অবস্থা বলে।

অনুরোদন:- আর্থিক জরুরী অবস্থা রাষ্ট্রপতি দ্বারা ঘোষিত হলেও তা দুই মাসের মধ্যে সংসদের উভয় বাক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। অনুমোদন না পেলে তা ২ মাস পরে বাতিল হয়ে যাবে।
ফলাফল :-আর্থিক জরুরী অবস্থার কতগুলি ফলাফল লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল –
(১) আর্থিক জরুরী অবস্থার সময় কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে আর্থিক বিষয়ে নির্দেশ দান করতে পারে। এই ধরনের অবস্থা, সৃষ্টি হলে প্রয়োজন মনে হয় হলে সুপ্রিমকোর্ট ও হাই কোর্টের বিচার পতিদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা রাষ্ট্রপতিকিছু কালের জন্য কম করার নির্দেশ দিতে পারেন।
(২) কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারী কর্মিদের বেতন ভাতা রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দানের অধিকারী হন।
(৩) ভারতের ঐক্য ও জাতীয় সংহতী লক্ষ্য করার জন্য এবং বিচ্ছিন্নতা বাদী শক্তি যাতে মাথাতুলতে না পারে তার জন্য জরুরী অবস্থায় ঘোষনা কার্যকরি ভূমিকা পালন করলে এই অবস্থা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

7. গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলী উল্লেখ কর?

উঃ -পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বশেষ পর্যায় রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান পশ্চিম রঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যা বলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
যথা:- (১) বাধ্যতা মূলক কাজ।
(২) অর্পিত কাজ।
(3) স্বেচ্ছাধিন কাজ।

(১) বাধ্যতামূলক কাজ:- গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর বাধ্যতা মূলক কাজগুলি আইন গত ভাবে অর্পিত হয়েছে রাজ্য সরকার এই সমস্ত কাজ গুলি দিয়ে থাকে। সেই কাজ গুলি হল –

(1) পানিয় জল সরবরাহ করা, এবং সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পরিষ্কার রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
(২) সকলের জন্য উন্মুক্ত পুকুরগুলি রক্ষণাবেক্ষন করা,
(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হল তহবিল নিয়ন্ত্রন করাও পরিচালনা করা।
(৪) ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারনের ব্যবস্থা করা,
(৫) বর্জনীয় জায়গা গুলিতে অবৈধ দখল অপসারনের ব্যবস্থা করা।
6) গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিকানার দখল বা অন্যান্য সম্পত্তি আছে সেগুলিকে রক্ষণা বেক্ষন করা ও মেরামতি করা।

(২) অর্পিত কাজ:-- রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পিত বারে থাকে। রাজ্য সরকার দ্বারা এই ধরনের কাজ গুলিকে অর্পিত কাজ বলে যা পরবর্তী কালে বাধ্যতা মূলক কাজ হয়ে ওঠে। এই ধরনের কাজকে আবার হস্তান্তর জনিত কাজ ও বলা হয়। এই ধরনের কাজের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল –

(1) কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদী শিক্ষার ব্যবস্তা করা গ্রামীণ চিকিৎসা লয়, মিমুকল্যান কেন্দ্র, স্বায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা,
(2) সমাজিক শিক্ষা।
(3) প্রাথমিক শিক্ষা।
(4) মহিলা ও শিমুদের জন্য উন্নয়ন মূলক কাজ করা।
(5) গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি তাদের নিজ এলাকার ভূমি সংস্কারের সুষ্ঠু রুপায়নের ব্যবস্থা করে থাকে।
(6) পল্লি অঞ্চলে বাগিচা চাষের জন্য উন্নয়ন মূলক ব্যবসা করা এবং অনাবাদি জমিকে চাষ যোগ্য করার ব্যবস্থা করা।
(7) গ্রামীণ গৃহ নির্মাণে সম্পর্কিত কার্যসূচী গ্রহন করা।
(8) সমবায় মূলক কাজের মাধ্যমে গ্রামের জমিও অন্যান্য সম্পদ সমূহের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকে।

(৩) স্বেচ্ছাধীন কাজ::- যেসব কার্যাবলি পঞ্চায়েত স্বোচ্ছা করতে পারে সেই গুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাধীন কাজ বলে, তবে প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য সরকার ও পঞ্চায়েতের ব্যাপারে কিছু দ্বায়িত্ব দিতে পারে এই স্বেচ্ছাধিন কাজের মধ্যে উল্লেখ যোগ হল–
(1) দারীদ্র দূরী করনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(2) জন সাধারনের যাতায়াতের বা রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা,
(3) বাজার, হাট, মেলায় ইত্যাদী প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রন করা,
(4) সর্বসাধারনের জন্য সংশ্লিষ্ট, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর, দিঘি, ইত্যাদী খনন করা।
(5) লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা এবং রক্ষনাবেক্ষন করা।
(6)খেলাধুলা এবং অন্যান্য সংস্কৃতিক কাজকর্মের বিকাশ সাধন করা।

এছাড়া মাছ চাষের বিকাশ সাধন করা, এছাড়া প্রতিবন্ধি ও মানসিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া লোক জনের কল্যাণ করা ও বাস্তবায়ন করা।

8. পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর?

উঃ - 1973 সালে পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতিয় স্তরে অবস্থিত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সকালের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং তার জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি 5 বছরের মেয়াদে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করবে। এই পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, সকল মানুষের জন্য আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে কাজ করে পঞ্চায়েত সমিতির উল্লেখ যোগ্য কার্যাবলি উল্লেখ করা হল -

(1) দারীদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী :- পঞ্চায়েত সমিতির হাতে দরিদ্র্য দূরিকরণের ব্যাপারে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করার দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকার অথবা অন্য কোনো কর্তিপক্ষ যদি কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে দারীদ্র দূরীকরণে কর্মসূচী পালন করবে।

(২) প্রকল্প গ্রহন ও আর্থিক সাহায্য প্রদানঃ- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, প্রথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, জল সরবরাহ, গ্রামীণ ঋন, মৎস চাষ গ্রামীন হাসপাতাল যোগাযোগ ব্যবস্থা নারী ও শিশু কল্যান, সামাজিক বন সৃজন ইত্যাদী বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনকল্যানের ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ করা ও এই সব ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দান করা পঞ্চায়েত সমিতির কাজ।

(3) অর্থসাহায্যঃ-' কোনো পৌর সভার দ্বারা জল সরবরাহ বা মহামারী প্রতিরোধের ব্যাপারে ব্যাংক নির্বাহের জন্য যদি রাজ্য সরকার অনুমোদন করে তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি অর্থ সাহায্য করবে।

(4)বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন:- পঞ্চায়েত সমিতির ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের পরীক্ষা ও অনুরোদন সংক্রান্ত কাজের দ্বায়িত্ব পালন করে থাকে।

(5) অর্পিত দ্বায়িত্ব :- রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতির হাতে যে সব কাজের দ্বায়িত্ব দেবেন পঞ্চায়েত সমিতি সেই সব দ্বায়িত্ব পালন করবে।

(6) নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা বিষয়ক কাজ :- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, যোগাযোগ, হাট বাজার, অতিথি নিবাস নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার ও রক্ষনা বেক্ষন করবে পঞ্চায়েত সমিতি।

মূল্যায়ন:--উপরক্ত এই সকল কার্যারলি ছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতি সমন্বয় মূলক কাজ ও বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বায়িত্ব ও পালন করে থাকেন। আবার কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত যদি প্রকল্প গ্রহণ করে পঞ্চায়েত সমিতির হাতে তুলে দেয় সেই ক্ষেত্রে সে দ্বায়িত্ব গ্রহন করে থাকে।

(9) এত তম সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনা কর?

উঃ –প্রক স্বাধীনতা যুগ থেকে মহাত্মা গান্ধি ও পরবর্তীকালে প্রশাসনের একক হিসাবে গ্রামীন শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 1956 সালে বলবন্ত রায় মেহেতা কমিটি গঠন ও সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রামীন শাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি স্থগিত হয়। তবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষা পটে গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপে ভারতের সংবিধানে 73 তম সংবিধান সংশোধনী আইন 1992 সালে 73তর সংবিধান সংশোধনী আইনে নবম অংশটি যুক্ত করা হয়, এই অংশে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা বিধিব্যবস্থা গুলি সংযুক্তকরা হয়েছে তাছাড়া সংবিধানে 243 নং ধারাতে পঞ্চায়েত ব্যবসুরো যুক্ত করা হয়েছে। গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম সর্ত হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন, এই 73 তম সংবিধানে সংশোধন গ্রামীন শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব দিয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ের সরকারের মর্যদা দিয়েছে। 73 ৩য় সংবিধান সংশোধনে মূল বৈশিষ্ট গুলি হল –

(1) গ্রামসভাঃ- একটি পঞ্চায়েত এলাকায় সকল ভোটারদের নিয়ে একটি গ্রামসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে রাজ্য আইন সভা আইন প্রনয়নকরে গ্রামসভা গুলির ক্ষমতার এলাকা ঠিক করে দেয়।

(২) মধ্যবর্তী পর্যায়ঃ – এই সংশোধনী আইনে গ্রাম, মধ্যবর্তী জেলাস্তরে তিন ধরনের পঞ্চায়েত গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব অঙ্গরাজ্য লোক সংখ্যা ২০ লক্ষের নীচে সেই সব অঙ্গ রাজ্যের মধ্যবর্তী পর্যায় গঠনের দরকার নেই।

(3) পঞ্চায়েত গঠনঃ- সংবিধান সংশোধন অনুসারে রাজ্য আইনসভার সংবিধানে নবম অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়ন করবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ে পঞ্চায়েতের লোক সংখ্যাও আসন সংখ্যার মধ্যে অনুপাত বজায় রাখতে হবে, এবং পত্যত্র ভোটের মাধ্যমে সদস্য গন নির্বাচিত হবেন।

(4) সংরক্ষন ঃ- তপশীলি জাতী ও উপজাতী ভুক্ত মহিলাদের পঞ্চায়েতের মোট আসনের 1/3 অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। তাছাড়া পঞ্চায়েতের সভাপতির পদসংখ্যা অনুসারে সংরক্ষণ করা হবে। পঞ্চায়েতের 3টি পর্যায়ে সভাপতির পদের ক্ষেত্রে 1/3 অংশ আসন মহিলাদের জন্য সরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।
(৫) কার্যকালঃ- পঞ্চায়েতের কার্যকালের মেয়াদ হবে 5 বছর। তবে এই কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়া যাবে তবে সেই ক্ষেত্রে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত শুধু মাত্র অবশিষ্ট সময়ের মেয়াদের জন্য কার্যকারী হবে। পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়া 6 মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(6)অর্পিত ক্ষমতাঃ- সংবিধান অনুসারে রাজ্য আইন সভা আইন প্রণয়ন বারে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেবে সেই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য পরিকল্পনা বনায়ন করবে।

(7) সদস্যদের অযোগ্যতা :- কোনো পার্থিব বয়স 21 বছরের কম হলে তাহলে তাকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। অযোগ্যতা নিয়ে যদি কোনো সদস্যের যদি বিতর্কির সৃষ্টি হয় তাহলে রাজ্য আইনসভা দ্বারা কার্তিপক্ষ সে বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(8) করধার্য :- রাজ্য আইনসভার কর ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতাদান করেছে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত আইনে একটি অর্থকমিশনের গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই অর্থকমিশন পঞ্চায়েতের আর্থিক ব্যবস্থা দেখবেও সেই ব্যাপারে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করবে তাছাড়া রাজ্যসরকার তার সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থদান করতে পারেন।

(ত) কার্যাবলিঃ– রাজ্যসরকার পঞ্চায়েত আইন তৈরির সময় একাদশ তালিকাটি অনুসরন করবে এখানে উল্লেখিত বিষয়গুলি হল– কৃষি, গ্রামীন শিল্প, ভূমিসংস্কার পানীয় জল সরবরাহ, দারীদ্রদূরীকরণ, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদী।

পর্যালোচনাঃ এই 73তম সংশোধনী আইনের ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা একটি সংবিধানিক মর্যদা লাভ করে এবং রাজ্য সরকার এ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠনের ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। পঞ্চায়েত গুলির হাতে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য এই ব্যবস্থা এবং সাবলম্বী হয়ে উঠতে পেরেছে।

10. পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ কর?

উঃ – পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পৌর আইনে পৌরসভাগুলির হাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে, বর্তমান আইন অনুসারে পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বহু ও বিভিন্ন, পৌরসভার কার্যাবলীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ক্ষমতা ও কার্যাবলির এই তিনটি ভাগে হল :-
(১) বাধ্যতামূলক।(২) স্বেচ্ছাধীন ,(৩) অর্পিত। 1993 সালে পশ্চিমবঙ্গে পৌর আইনের 63থেকে 66 নং ধারার মধ্যে এ বিষয় আলোচনা আছে।

(১) বাধ্যতামূলক কার্যাবলী::- পৌরসভার বাধ্যতামূলক কার্যাবলী আবার চার ধরনের। পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা আইন (1993) এর 63 ধারায় এ বিষয়ে আলোচনা আছে। পৌরসভার বাধ্যতামূলক কাজকর্মের তালিকায় 49টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। বাধ্যতামূলক কার্যাবলীর চারটি ধরন হল :- (ক)প্রশাসনিক ,(খ)উন্নয়নমূলক , (গ) জন কল্যানমূলক এবং (ঘ) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত।

(ক) প্রশাসনিক ঃ- পৌরসভার কতগুলি প্রশাসনিক কাজকর্ম আবশ্যিক। এগুলি হল :- পৌর এলাকার সীমানা নির্ধারণ পৌরসভার কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা; প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কিত তথ্যাদি সংকলন ও নথিপত্র সংরক্ষন, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ; পৌরসভার সম্পত্তি ও সরকারী সম্প্রতি

সংরক্ষণ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বে-আইনী গৃহনিমাণ বোধ, সর্বসাধারণের জায়গার বে-আইনী দখলকারী প্রতিরোধ; পৌর পরি সেবা সমূহের অপচয় রোধ, পুরকর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস পালন, অগ্নি নির্বাপনের ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি।

(খ) উন্নয়নমূলক :--পৌরসভাকে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতগুলি আবশ্যিক কার্য সম্পাদন করতে হয়। । এগুলি হল: পৌরসভায় এলাকার অভ্যন্তরে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পৌরসভার সীমানা সংলগ্ন এলাকার বিধিসম্মত বিকাশের ব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন এলাকার, উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন, পরিষেবামূলক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগীতা কেবল লাইন, পাইপ, টিউব প্রস্তুতি ও রক্ষনাবেক্ষনকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা।

(গ) জনকল্যানমূলকঃ- পুর কর্তৃপক্ষকে কতগুলি জনকল্যান মূলক পূর্তকার্য সম্পাদন করতে হয়। এগুলিও আবশ্যিক প্রকৃতির, জনকল্যানমূলক এই কার্যাবলী হল:- জল সরবারাহ সর্বসাধারনের জন্য শৌচাগার সৃষ্টি ও সংরক্ষন পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষন, পৌর এলাকায় বাজার, কসাই খানা প্রভৃতি নির্মাণ, নিয়ন্ত্রন ও রক্ষণাবেক্ষণ ,পথঘাট, প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পথঘাট আলোকিত করা, ঘরবাড়ির নম্বর নির্ধারণ ও রাস্তার নামকরন।

(ঘ) জনস্বাস্থ্যঃ- জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু আবশ্যিক কার্য পৌরসভাকে সম্পাদন করতে হয়। এগুলি হল:- পৌর এলাকায় সর্বসাধারনের ব্যবহার্য শৌচালয়গুলির সংস্কার সাধনঃ দূষণকারী তরল ও কঠিন যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ অপসারন, রোগ প্রতিরোধের জন্য টাকা দানের ব্যবস্থা এবং মারাত্মক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা, পরিশ্রুত জানীয় জল সরবরাহ, মৃতদেহ সৎকার, পথঘাট ও সর্বসাধারনের ব্যবহার্য স্থান সমূহ পরিষ্কার করা ও রাখা সর্বসাধারনের ব্যবহার্য জলের যাবতীয় উৎস সংরক্ষন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন, কুকুর ও অন্যান্য জীবজন্তুর উপদ্রব রোধ এবং বিপজ্জনক ব্যবসাপত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

(২) স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী:-- পৌরসভার স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলীর তালিকায় 41টি বিষয়ের উল্লেখ পরি লক্ষিত হয়। পৌরসভার স্বেচ্ছামূলক কার্যাবলি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ ধরনের কার্যাবলী হল:-
(১) প্রশাসনিক,
(২) উন্নয়নমূলক,
(৩) জনকল্যাণমূলক,
(৪) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত।
(৫) শিক্ষা সম্পর্কিত।
এ বিষয়ে 1993 সালে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনে 64 ধারায় আলোচনা আছে।

(1) প্রশাসনিক কার্যাবলি : পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যাবলি হলঃ যাদুঘর প্রকৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ; মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন; গুনিজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও গুনিজনের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা, সামাজিক কল্যানের স্বার্থে স্বেচ্ছাশ্রমের সংগঠন ও সমন্বয় সাধন, যানবাহনের সৃষ্টি ও সংরক্ষন এবং মেলা ও প্রদর্শনী সংগঠনে।
(২) জনকল্যানমূলক কার্যাবলি :- পৌরসভার কার্যচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রসূতিসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষন, পাঠাগার, দোকান বাজার, কর্মমালা, যাদুঘর, প্রতীক্ষালয় প্রকৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষন, যানবাহন ব্যবস্থা, অল্প ব্যয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে ব্যবস্থা এবং অনাথ আশ্রর ও বৃদ্ধ নিবাসের ব্যবস্থা।

(3) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী :- অক্ষম, অনাথ ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন, শহর উন্নয়নের পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক উন্নয়নের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন, সমবায় সমিতিসমূহের বিকাশ সাধন, অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের জন্য রোজ গারের ব্যবস্থা, ইমারতী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সঠিক দামে বন্টনের ব্যবস্থা ইত্যাদী।

(4)জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলীঃ- পরিশ্রুত পানীয় ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ, অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিসের ব্যবস্থা দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা, ধোঁয়া – দখল রোধের ব্যবস্থা, জৈব সার সৃষ্টির জন্য বর্জ্য বসু ব্যবহার এবং অচিরাচরিত শক্তিসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি।

(5)শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী :- প্রথাবহিভূত ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষায়তন সৃষ্টি ও সংরক্ষন, সংস্কৃতিক ও শারীর শিক্ষার বিকাশ সাধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন পুস্তক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি ক্রয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন।

(গ) অর্পিত কার্যাবলী:- আবার রাজ্য সরকার কতগুলি কাজকর্মের দ্বায়িত্ব ও ক্ষমতা পৌরসভার হাতে অর্পন করতে পারে। এ ধরনের কার্যাবলীর তালিকায় 17 টি বিষয় বর্তমান। পশ্চিবঙ্গ পৌর আইন, (1993) এর ধারার এ বিষয় আলোচনা আছে। পৌরসভার অর্পিত কার্যাবলী হল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, নগর পরিকল্পনা, অসামরিক প্রতিক্ষা ও অগ্নি নির্বাপন, নগর উন্নয়ন, খাদ্য সামগ্রির সরবরাহ নিয়ন্ত্রন, জল সরবারাহ ব্যবস্থা ক্রীড়া ও যুবকল্যান, ত্রান ও সমাজকল্যান, যানবাহন ব্যবস্থা, পূর্ত বিষয়ক কার্যাবলী বিবিধ শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচী, সামাজিক বনসৃজন, পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসংস্থান, পরিকল্পনা, কুটির শিল্প এবং তফশীলি জাতি ও উপজাতি কল্যান। তবে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাণী ও অর্থি সরবরাহ করে।

11. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় প্রবণতার কারণগুলি উল্লেখ কর?

উঃ- বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন অর্থনৈতিক মন্দা, উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব ইত্যাদী এক সাথে চলার নীতি না গ্রহন করলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে এর জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বদা বৃদ্ধিও শক্তি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দেশে বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্র প্রবনতাকে ঝোঁক লক্ষ করা যায়। ভারতে ও এই ধরনের কেন্দ্র প্রবনতা লক্ষ করা যায় তার কারনগুলি হল –

(1) সমস্যার সমাধানঃ- দুটি আলাদা রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এই দেশ ভাগ বহু জটিল সমস্য, খাদ্য সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা এই সব সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য দরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে মজবুত করা, এই সব কারণে কেন্দ্রীয় প্রবনতা বৃদ্ধিপেয়েছে।

(২) জাতীয় গৌরবঃ- স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ জুড়ে শিল্পায়ন দ্রুত ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার ঘটেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছে। সমগ্র দেশ জুড়ে এই উন্নিতির ফলে একটি জাতীয় গৌরব আর্বিক ভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

(3) কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রায়দান:- ভারতের কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় প্রবনতার জন্য অনেক খানি দাবী। কেন্দ্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রিমকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে যার ফলে কেন্দ্রীয় প্রবনতা অনুভূত হয়েছে।

(4)রাজনৈতিক পরিস্থিতিঃ- অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজ্যগুলি সয়ংসম্পূর্ণ নয় রাজ্যের রাজস্বের পরিমান খুবই কম যা দিয়ে রাজ্য তার নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে না। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরনাপন্ন, হতে হয়। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থির কারণে কেন্দ্রীয় সরকার তার কেন্দ্রীয় প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। উপরক্ত এই সকল কারন গুলি ছাড়াও ঐতিহাসিক ই উত্তরাধিকার, বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিরোধ এবং আন্তর র্জাতিক নির্ভর শীলতা ইত্যাদী কারণে ভারতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রবনতা লক্ষ করা যায়।